# ডাইনোসরের ডাক

কিন্নর রায়

প্রাপ্তিস্থান : মৌসুমী প্রকাশনী
১এ কলেজ রো, কলকাতা-৯

প্রকাশকাল :
মার্চ, ১৯৬০

প্রকাশিকা :
তাপসী সেনগুপ্ত,
কসমো-স্ক্রিপ্ট
১১, নিতাই বাবু লেন,
কলকাতা-১২

মুদ্রক :
শ্রীসাধনকুমার গুপ্ত
শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রিন্টিং
২১/বি, রাধানাথ বোস লেন
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ :
সন্তোষ গুপ্ত

চুমকি চট্টোপাধ্যায়
এষা চট্টোপাধ্যায়
অন্বেষা চট্টোপাধ্যায়
ও
ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়

চারজনকে

## ট্রেনের পাশে ডাইনোসোরাস

কাল রাতে সেই খোকা-ডাইনোকে আবার দেখতে পেল পূষণ। স্বপ্নে! খোকা না হয়ে সেটা হতে পারে খুকি-ডাইনোসোরাসও। দিব্যি তৃণভোজী। ঘাসপাতা খায়। টিরানোসোরাস রেক্সের মতো মাংসখোর নয়। স্বপ্নের জায়গাটা ঠিক ঠিক চিনতে পারছে না পূষণ। যেটুকু মনে আছে, তা হল সামনে অনেকখানি ফাঁকা মাঠ। সেই মাঠে তেমন ঘাস নেই। বরং ছোটবড় অনেক পাথর পড়ে আছে। মাঠটা দেখতে-দেখতে পেরিয়ে গেছে অনেকটা। দূরে একটা এঁকেবেঁকে চলে যাওয়া রেললাইন। সেই লাইনের ওপর দিয়ে ট্রেন দৌড়ে গেলে মনে হয় একটা ছবি চলে গেল।

সন্ধে হয়ে আসছে। একটু আগে সূর্য ডুবে গেল। তারপর পরিষ্কার আকাশে অনেক তারা। তাদের টিপটিপ আলোর ভেতরই গোল আস্ত একখানা চাঁদ উঠে এল। সেই চাঁদের আলোয় পূষণকে দিব্যি পিঠে বসিয়ে বাচ্চা ডাইনোসর গদাইলশকরি চালে হাঁটতে-হাঁটতে ছবি হয়ে জেগে থাকা রেললাইন পেরিয়ে আরও দূরে চলে যেতে চাইছে।

খুব মজা লাগছে পূষণের ডাইনোসোরাসের পিঠে চেপে। ওফ, স্কুল যাওয়া নেই। সাঁতার, আঁকা, সেতারের ক্লাস, হোমটাস্ক নেই। দিদিমণি-মাস্টারমশাইরা কেউ আসবে না তাকে বিরক্ত করতে। নিজের ছোট ছোট দু-হাত দিয়ে প্রাণপণে খোকা-ডাইনোর গলা আঁকড়ে আছে পূষণ। মাথার ওপর চাঁদ হাসছে। হাওয়া দিচ্ছে সুন্দর। এখন পূষণকে কেউ কিচ্ছু বলতে পারবে না। মা না, বাবা না, আনটি, স্যার—কেউ না। এসবই পরপর দেখে যাচ্ছে ক্লাস টু-র পূষণ সেন। ইংলিশ মিডিয়াম। সবে পড়তে শুরু করেছে দুধের দাঁত। ওপর-পাটির একেবারে সামনের তিনটে দাঁত আর নিচের-পাটির একটি পড়ে গিয়ে পূষণকে রীতিমতো ফোকলা লাগে। চোখে বেশি পাওয়ারের চশমা। হাসলেই বেরিয়ে আসে ফোকলা-মাড়ি। তবে ফোকলা বা ফোগলা যাই বলুক না কেন সবাই, পূষণের বাবা তাকে বোঝান, তেমন কিছু নয় এটা।

সেই খুকি অথবা খোকা-ডাইনোর গলা দু-হাতে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে পূষণ যখন রেললাইন পেরিয়ে আরও দূরে চলে যেতে চাইছে, তখনই তার পেছন থেকে হঠাৎ দৌড়ে এল টিরানোসোরাস রেক্স। কি তার গর্জন। সেই ডাকে বুকের রক্ত বরফ হয়ে যায়।

ডাকার সঙ্গে-সঙ্গে মুণ্ডু নাড়িয়ে, ল্যাজ আছড়ে, খুব জোরে প্রায় লাফ দিয়ে-দিয়ে ছুটে আসছে টিরানোসোরাস রেক্স। তার এই ভয়ানক তর্জন-গর্জনে আকাশের চাঁদও ভয় পেয়ে লুকিয়ে পড়ল মেঘের আড়ালে। টিরানোসোরাস রেক্স কি ধরে ফেলবে আমাদের? ও বাবা! ধরলে তো আর রক্ষে নেই। সঙ্গে সঙ্গে জলখাবার। ডাইনোর পিঠে গলা জড়িয়ে বসে থাকা পূষণ ভাবল।

আসলে দু-পা দু-হাতের বেড় দিয়ে অনেকটা গাছে চড়ার ভঙ্গিতে ডাইনোর পিঠে চড়া খুব আরামের নয়, সেটা পূষণ এখন বুঝতে পারছে। কিন্তু করা যাবে কি! গলা বাড়িয়ে বিশাল ঝাঁকড়া একটা গাছের ডাল ভেঙে কচিপাতা মুখে পুরতে পুরতে ডাইনোটা যে পরিষ্কার বাংলায় বলল, আমার পিঠে উঠে পড়। তোমায় বেড়াতে নিয়ে যাব।

কোথায় নিয়ে যাবে?

চলোই না।

আর এটুকু শুনেই ইংলিশ মিডিয়ামের ক্লাস টু-র পূষণ সেন বুঝতে পারল এই ডাইনোর পিঠে উঠলেই হাজার মজা। তাই তাড়াতাড়ি ডাইনোর পিঠে উঠে বসল পূষণ।

তখনই সিনেমায় দেখা গডজিলা কোনও একটা জঙ্গলের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল।

নাক-মুখ দিয়ে আগুন ছড়াতে-ছড়াতে, গাছপালা, বাড়ি ভাঙতে-ভাঙতে এগিয়ে আসছে গডজিলা। তার চিৎকারেও রক্ত জল হয়ে যায়। হাঁ করলে বোঝা যায় মুখের ভেতর বড়বড় দাঁত।

গডজিলা মাঝে মাঝেই ভয়ংকর জোরে ডেকে উঠছে। তারপর কাঁটাওয়ালা বিশাল মোটা ল্যাজ আছড়াতে-আছড়াতে দু-পায়ে দু-হাতে—নাকি চারটেই পা গডজিলার, পূষণ বুঝতে পারছে না এখন ঠিকঠাক—সেই চার-পা বা চার-হাত-পায়ে বড় বড় বাড়ি গুঁড়িয়ে দিতে-দিতে এগিয়ে আসছে গডজিলা।

ওদিকে ছোট ডাইনো তো টিরানোসোরাস রেক্সের হাত থেকে বাঁচার জন্যে প্রাণপণ দৌড়চ্ছে। হঠাৎ গডজিলা আর টিরানোসোরাস রেক্স মুখোমুখি হয়ে গেল। প্রথমে পাশাপাশি। তারপর মুখোমুখি। ব্যস, আর যায় কোথায়! হুড়যুদ্ধ লেগে গেল একেবারে।

গর্জনে-গর্জনে মনে হচ্ছে আকাশ ফেটে যাবে। উল্টে যাবে চারপাশের সব কিছু।

চাঁদের আলোর নিচে গডজিলা আর টিরানোসোরাস রেক্স—দুজনে দুজনের দিকে তাক করে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর হাতে হাতে, দাঁতে দাঁতে, নখে নখে, মাথায় মাথায়। সে এক বিভীষিকা-লড়াই। ভয়ংকর তর্জন-গর্জনে আশপাশে আর কেউ নেই। সেই ফাঁকে ডাইনোর পিঠে টিরানোসোরাস রেক্সের ভয়ে জড়সড় হয়ে ঝুলে থাকা পূষণ সেই ছবি হয়ে ফুটে থাকা রেললাইন পেরিয়ে কত, কত দূরে।

একটু-একটু করে দূরে সরে যাচ্ছে গডজিলা আর টিরানোসোরাস রেক্সের গর্জন।

এই স্বপ্নটাই পূষণকে ঘুমের ভেতর নেড়ে দিয়ে গেল। এখন পূষণের চোখে চশমা নেই। ট্রেনে বাংকের ওপর শুয়ে একা-একা ঘুমোতে যাওয়ার আগে মা বাড়িতে যেমন করেন, তেমনই চশমা খুলে নিয়েছেন। কিন্তু তাতেও স্বপ্নের ডাইনো, টিরানোসোরাস রেক্স, গডজিলা, গডজিলা আর টিরানোসোরাস রেক্সের লড়াই দেখতে পূষণের কোনও অসুবিধে নেই। অথচ চশমা চোখে না দিলে কোনও কিছুই ভালো করে দেখতে পায় না পূষণ। চোখে চশমা না রাখলেই বেড়ে যায় চোখ পিট-পিট। বাড়ে মাথার যন্ত্রণা। কপালের ব্যথা।

ট্রেনের ভেতর তিনতলা বাংকের দোতলায় একলা পূষণ। একতলায় পূষণের মা। তিনতলায় বাবা। উল্টোদিকে একতলায় ক্লাস থ্রি-র কাহিনীদিদি। দোতলায় জ্যেঠিমা—কাহিনীদিদির মা। সবার ওপরে কাহিনীদিদির বাবা দেবুজ্যেঠু।

এখানে একটা কথা বলে নেওয়া ভালো, ইংলিশ মিডিয়ামের ক্লাস টু-র পূষণ সেন কাহিনীদিদির বাবাকে দেবুআংকল বললে খুব রেগে যায় কাহিনীদিদির বাবা। বলে,—এই, আংকল কি রে! কাকা, মামা, জ্যেঠু বলতে পারিস না! আমি আসলে কোনটে তোর? কাকা, মামা, না জ্যেঠু?

অনেক ভেবে-টেবে, বাবাকে জিগ্যেস করে পূষণ ঠিক করেছে—দেবুজ্যেঠু। আনটি বললে অবশ্য রাগ করে না কাহিনীদির মা। কিন্তু তাকেও জ্যেঠিমা বলে পূষণ।

ঘুমের ভেতর বেশ জোরে নাক ডাকে দেবুজ্যেঠুর। এটা পূষণ জানে। কাহিনীদিদের সঙ্গে বেশ কয়েকবার দূরে কাছে বেড়াতে গিয়ে নাক ডাকার এই ব্যাপারটা টের পাওয়া গেছে। কিন্তু নাক ডাকার আওয়াজ তবু সহ্য করা যায়। কিন্তু গডজিলা আর টিরানোসোরাস রেক্সের মধ্যে যে ধুন্ধুমার লড়াই হচ্ছে, তার গর্জন আর সহ্য করা যাচ্ছে না।

ঘুমের মধ্যেই দু-হাতের পাতায় নিজের দু-কান ঢেকে ফেলল পূষণ। গডজিলা আর টিরানোসোরাস রেক্সের লড়াই তখনও চলেছে। গডজিলার মুখ থেকে আগুনের স্রোত বেরিয়ে আসছে।

ট্রেন চলার অল্প অল্প দুলুনি আছে। তার সঙ্গে চায় গ্রম, গ্রম চায়। পান ব্রি—সিগ্রেট। ব্রি-পান। আরও কি-কি সব শব্দ আছে। লোকজনের ওঠানামা আছে। তার মধ্যেই ঘুমের পাতলা সরমাখা পূষণ কেঁপে উঠছে মাঝে-মাঝে।

সিনেমার গডজিলা আকাশ ছোঁয়া বড়বড় বাড়ি, নদীর ওপর পাকা-পোক্ত লোহার বড় ব্রিজ, বিশাল বিশাল টাওয়ার, ইলেকট্রিক যাওয়া-আসার নানান লম্বা-চওড়া জিনিসপত্র ওপড়াতে ওপড়াতে এসে টিরানোসোরাস রেক্সের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

তারপর কি থেকে কি হল, দুজনে মরণপণ কুস্তি থামিয়ে আকাশের দিকে মুখ তুলে ভয়ংকর গর্জন করতে করতে আবার এগোতে লাগল ডাইনোর পেছনে।

এবার আর কিছু করার নেই। ডাইনোর গলা ধরে প্রায় ঝুলে থাকা পূষণ আর কিছু করতে পারবে না। ঠকঠক করে তার কাঁপুনি শুরু হয়ে গেল।

বরাভূম স্টেশনে নামার কথা পূষণদের।

স্টেশনের নাম বরাভূম। কিন্তু জায়গাটার নাম বলরামপুর। এ যেন কেমন এক ম্যাজিক। পুরুলিয়ার একদম শেষ মাথায়। খানিকটা গেলেই এখনকার ঝাড়খণ্ড। আগে ছিল বিহার। সেখানে গৈরিক জ্যেঠুদের নিজেদের

বাড়ি। স্টেশনের থেকে হেঁটে বড়জোর দু-মিনিট। সেখানেই পুজোর চারদিন কাটবে। কাছেই অযোধ্যা পাহাড়। ওখানেও বেড়াতে যাওয়ার কথা। যাওয়া হবে চড়িদায়। আরও কোথাও-কোথাও। খুব আনন্দ হবে।

বরাভূম পৌঁছনোর অনেক আগে শেষ রাতে পুরুলিয়ায় দাঁড়িয়েছিল বড় ট্রেন। স্টেশনে গাড়ি দাঁড়াতেই ঘুম ভেঙে গেল পূষণের। পুজোর আগে আবহাওয়া তেমন ভালো নয়। মাঝে মাঝেই বৃষ্টি।

পুরুলিয়ায় ট্রেন ঢোকার আগে পূষণ স্বপ্নে তার স্কুল দেখতে পাচ্ছিল। হোমটাস্কের খাতা। ফ্যানটম তার স্কুলের দরজায় দাঁড়িয়ে। পূষণকে দেখেই স্যালুট দিয়ে বলল ফ্যানটম, আপনি মিস্টার পূষণ সেন, আপনার সঙ্গে কিছু কথা আছে। এসবই ফ্যানটম বলল ইংরেজিতে।

আমার সঙ্গে দরকার! মিস্টার ফ্যানটম—ডেনকালির জঙ্গল, গুরান, বুড়ো মজ, খুলি গুহা, কিলাউয়িয়র সোনাবেলা, কুকুর—না কুকুর নয় ওটা নেকড়ে—তার নাম বাঘা, আর আছে শাদা ঘোড়া হিরো, তার দরকার আমার সঙ্গে! কোথাও বোধহয় ভুল হচ্ছে মিস্টার ফ্যানটম। এ সবই ইংরেজিতে নিজের মতো করে বলল পূষণ।

হ্যাঁ, আপনার সঙ্গেই দরকার। বাইরে স্পাইডারম্যান, ব্যাটম্যান, সুপারম্যানরাও অপেক্ষা করছে।

কি বলছেন আপনি ফ্যানটম! স্পাইডারম্যান, ব্যাটম্যান, সুপারম্যান—সবাই! কোথায়!

একটু ও পাশে।

কিন্তু আমি যে ফোকলা। আমার ওপর পাটির তিনটে দাঁত নেই। তলারও একটা পড়ে গেছে।

তাতে কি হল!

কি বলছেন আপনি ফ্যানটম! স্কুলে সবাই আমায় ফোকলা, বুড়ো বলে খ্যাপায়।

ঠিক আছে। আর খ্যাপাবে না!

আপনি বলছেন!

হ্যাঁ, বলছি। এই দেখুন, আপনার বাবারও দাঁত পড়েছিল।

বাবারও পড়েছিল?

হ্যাঁ। পড়েছিল তো। ঠিক আপনার মতো বয়েসেই—বলতে-বলতে ফ্যানটম তার খুলি চিহ্নওয়ালা আংটি পরা ডান হাতের আঙুল হাওয়ায় ঘোরাল।

আর ঘোরানোর সঙ্গে সঙ্গেই অবাক কাণ্ড।

পূষণ দেখল তার সামনে পূষণদের খড়দার বাড়ি। মামাবাড়ি। না, না—পূষণদের ম্যানডেভিলা গার্ডেনসের সেকেন্ড ফ্লোরে তিন কামরার নশো স্কোয়ার ফিটের ফ্ল্যাট নয়। খড়দার মন্দির পাড়ায় সত্যি-সত্যি বাড়ি। যেখানে পূষণের বাবা পার্থ সেন জন্মেছেন। বড় হয়েছেন। মামাবাড়ি—যেখানে পূষণের মা শুভ্রা বসু জন্মেছেন। বড় হয়েছেন। বাবা এই বাড়ির কাছাকাছি মাঠে কবাডি, ড্যাংগুলি, পিট্টু, ক্রিকেট, ফুটবল, গাদি, ঢপাঢপ, চোর চোর, হুসহুস, দলদল খেলেছেন। কোনও-কোনও দিন এসব খেলার বদলে লাললাঠি, রুমালচোর, চোর-পুলিশ।

পূষণ দেখল তার স্বপ্নের ভেতর বাবা দাঁড়িয়ে। বলছে, জানিস তো, তোর মতো আমারও দাঁত পড়ে গেছিল।

কবে? কবে? জানতে চাইল পূষণ।

কবে আবার! যখন আমি তোর মতো ছোট।

তারপর!

তারপর আর কি! সোজারথের দিন দাঁত পড়ল।

সোজারথ কি?

যেদিন রথে চড়ে জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রা মাসির বাড়ি যায়। তারপর ছ-দিন মাসির বাড়ি থেকে সাত দিনের দিন আবার ওই রথে চেপে ফিরে আসে —সেদিন উল্টোরথ। তো সে যাক গে। বাবার সঙ্গে মেলায় গিয়ে বড়-বড় ফজলি আম আর আনারস কিনে এনেছি। সঙ্গে পাতার বাঁশি, মাটির পুতুল, মাটির রথ। বাড়িতে পাপড়, আরও নানারকম ভাজা ভাজছে মা। নিচের পাটির মাঝখানের দুটো দাঁত তার আগে থেকেই বেশ নড়ছিল। ফজলি আমের আঁটি থেকে কামড়ে আম বের করে আনতে গিয়ে সেই নড়বড়ে দাঁতের একখানা পড়ে গেল। দুধের দাঁত তো, পড়বেই।

দুধের দাঁত কি?

ছোটবেলায় প্রথম যে দাঁত গজায়, তাকে বলে দুধের দাঁত। আর সেই দাঁত এক সময় পড়ে যায়।

হাউ সুইট!

হ্যাঁ, সুইটই তো।

নিজেদের স্কুল গেটের সামনে দাঁড়ান ফ্যানটম তার হাতের ছোঁয়ায় পৃষণের সামনে অন্য একটা জগৎ এনে দিয়েছে। স্বপ্নের মধ্যেই পৃষণ তার বাবাকে জিজ্ঞেস করল, তারপর কি করলে?

দাঁত পড়ার পর তুই কি করেছিলি।

ওই দাঁতটাকে একটা পেপারে ভালো করে র‍্যাপ করে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দিলাম।

তারপর? দেন!

দেন আর কি! ওই বাস্কেট থেকে সব ওয়েস্টেজ নিয়ে একটা বড় পলিপ্যাকে পুরে গীতা আনটি আমাদের কমপ্লেকসের বড় গারবেজ ভ্যাটে ফেলে দিয়ে এল। ব্যস, ফিনিশ।

আমাদের ছেলেবেলায় কিন্তু ব্যাপারটা এরকম ছিল না।

স্বপ্নে নিজের বাবার সঙ্গে কথা বলতে-বলতে পৃষণ জানতে চাইল, কেমন ছিল তোমাদের সময়ে?

তুই আমাদের খড়দার বাড়ি দেখেছিস তো?

হ্যাঁ। যেখানে দাদু থাকে?

ওকে। দ্যাটস রাইট।

আরও একজন দাদু আছেন না মামাবাড়িতে?

হ্যাঁ, উনি তোমার মায়ের বাবা।

তা উনিও দাদু, ইনিও দাদু? বোথ দাদুস!

বলতে পার। তবে আমার যিনি বাবা, তাঁকে তোমার নিয়ম মতো ঠাকুর্দা বলা উচিত। এও তো তোমায় আগে কতবার বলেছি। মনে রাখো না কেন?

আর দাদু?

যিনি তোমাদের মামাবাড়িতে থাকেন। তোমার মা, মাসি, মামাদের বাবা।

স্বপ্নের ভেতর পৃষণ দেখতে পেল একটা পুঁচকে নেংটি ইঁদুর কোন এক কোণা থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে বেরিয়ে এসে সেই ভয়ংকর দাঁতের পাটি বের করা গডজিলার কাছে ওর একটা দাঁত চাইছে।

নেংটিকে মারার জন্যে নিজের বড় বড় নখওয়ালা ভারি থাবা তুলল গডজিলা। তারপর ঘাড় বেঁকিয়ে গাঁ-গাঁ করে বলল, তোর এত বড় সাহস! তুই আমার দাঁত চাইছিস! আর তা দেখেই ওকে কিচকিচ করে কি যেন বলে একটু দূরে সরে গেল নেংটি।

পূষণের আগের স্বপ্নেও একটুখানি ছিল গডজিলা। তারপরই পূষণের মনে পড়ল এ তো খড়দায় আমাদের বাড়ির সেই নেংটি। যে একতলার যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়। আর মাঝে মাঝে এত জোরে দৌড়য়, কিছুতেই ধরা যায় না। বইখাতা, জামা-কাপড়, খবরের কাগজ কাটে প্রায়ই। তখন টনক নড়ে সকলের। আনো বিষ। মেশাও আলুর চপ বা অন্য কোনও খাবারের সঙ্গে। নয়তো কল আনো। তার ভেতর খাবার দিয়ে রাখ। লোভে-লোভে সেখানে রাত্তিরবেলা ঢুকে আটকে থাকবে নেংটিবাবাজি। সকালে উঠে তার ব্যবস্থা কর।

কিন্তু বাবা যে বলেছিল, খড়দার বাড়ির উঠোনের এককোণে বড় ফলসা আর নোনা গাছের পাশে মেঠো ইঁদুরের গর্তে নিজের পড়ে যাওয়া দুধে দাঁত ফেলেছিল। সঙ্গে বলেছিল, দু-লাইনের রাইমস মতো কি একটা! পূষণ হাতড়াচ্ছে ঘুমের মধ্যে।

গডজিলার কাছে দাঁত চাওয়া নেংটিটাই পরিষ্কার বাংলায় বলে দিল, ওমা! সে কি, তোমার কিছুই মনে নেই! আমার তো সব দিব্যি মনে আছে। তুমি এত চট করে সব ভুলে যাও না!

দাঁত চাওয়া নেংটিকে গাঁ-গাঁ গোঁ-গোঁ করে আবারও ধমকাল গডজিলা, তুই বড্ড বাড় বেড়েছিস নেংটি। এত বাড় ভালো নয়।

ওসব কথায় আদৌ কান না দিয়ে নেংটি কিচ কিচ করে বলে উঠল, খড়দার বাড়ির উঠোনে মেঠো-ইঁদুরের বড় গর্তে তোমার বাবা তার পড়ে যাওয়া দুধের দাঁত ফেলে দিতে-দিতে বলেছিল, ইঁদুর-ভাই ইঁদুর-ভাই, তোমার মতো ভালো দাঁত হোক আমার। আমার খারাপ দাঁত হোক তোমার।

পূষণ চুপ করে শুনছে নেংটির কথা।

আগের কথা শেষ করে তড়বড় তড়বড় করে বলে উঠল নেংটি, এখানেই শেষ নয়। আরও একবার-দুবার তোমার বাবাকে গিয়ে নিজের খসে যাওয়া দাঁত ফেলে দিয়ে আসতে হয়েছে গঙ্গায়।

কেন, গ্যানজেসে কেন? জানতে চাইল পূষণ।

ওই যে তোমার ঠাকুমা—মানে তোমার বাবার মা বললেন,—গঙ্গায় ফেলার জন্যে। আসলে মেঠো-ইঁদুরের গর্ত তোমার ঠাকুমার ঠিক পছন্দ হচ্ছিল না। গঙ্গায় ভাসালে সে দাঁত নাকি ভাসতে-ভাসতে সমুদ্দুরে যাবে। সেখানে হাঙররা আছে। হাঙরদের মতো দাঁত হবে তোমার বাবার, খুব ধারাল।

স্বপ্নের নেংটি, খড়দার বাড়ি—সব মুছে গিয়ে আবার ডেনকালির জঙ্গলের চলমান অশরীরী ফ্যানটম এল পূষণের সামনে। বলল, কি হল, সব দেখলে তো! নিশ্চয়ই দুঃখ নেই তোমার। একটা বয়েসে সবাইকেই ফোকলা হতে হয়। তোমার বাবাও হয়েছিলেন। বলতে বলতে ফ্যানটম পূষণকে নিয়ে স্কুলের বাইরে। আর তখনই পুরুলিয়া স্টেশন ছুঁয়ে ফেলল পূষণদের ট্রেন। লোকজনের নামা-ওঠা, কথাবার্তা, নানারকম শব্দে ঘুম ভেঙে গেল পূষণের। আর এখন, বরাভূম ঢোকার একটু আগে পূষণের ঘুম ভেঙে গেল মায়ের ডাকাডাকিতে। শুধু ডাকাডাকিই নয়, রীতিমতো ঠ্যালাঠেলি, অ্যাই পূষণ, পূষণ অমন করে চিৎকার করছিস কেন! এভাবে নড়াচড়া করলে পড়ে যাবি।

ট্রেন তখন কাঁটাডি ছাড়িয়ে বলরামপুরের দিকে যাচ্ছে।

গডজিলা, ডাইনোসর, টিরানোসোরাস রেক্স। বলতে বলতে পূষণ ধড়মড় করে উঠে বসল।

চশমা পরে হাতমুখ ধুয়ে নাও। এখনই ডেস্টিনেশন এসে যাবে। বলে পূষণের মা তাঁর মাথার কাছে রাখা পূষণের চশমা এগিয়ে দিলেন।

চশমা চোখে দিয়ে পূষণ দেখল বাইরে আশ্চর্য রোদ্দুর। হাওয়ায় ছুটির গন্ধ। পূষণের মনে হল তার হোমটাস্কের সমস্ত খাতারা কুটি কুটি করা ছেঁড়া পাতা হয়ে আকাশে উড়ে যাচ্ছে। উড়তে উড়তে সেইসব খাতার পাতারা মেঘ হয়ে গেল আকাশে।

কটা বাজল দেবু? পার্থ সেন জানতে চাইল দেবব্রত ঘোষের কাছে।

দেবু বলল, আটটা চল্লিশ।

কেমন হবে জায়গাটা? পার্থ জানতে চাইল।

তোমাকে আর শুভ্রাকে তো আগেই বলেছি, গৌরিকদের নিজেদের বাড়ি। ওর ঠাকুর্দা সুখেন্দুবিকাশ গাঙ্গুলি রেল কোম্পানির থেকে এ বাড়িটি

কিনেছিলেন। সে বাড়িতে ইঁদারা আছে। বাথরুম তেমন ভালো নয়। কিন্তু গৈরিকরা সকলেই খুব বড় মনের। ওর মা বারবার ফোন করেছেন আমায়, পম্পাকে। যাওয়ার জন্যে বলেছেন। ফোন করেছেন গৈরিকের স্ত্রী মিলি। ওদের গোটা পরিবারটাই খুব আন্তরিক। লোকজন পছন্দ করে। গৈরিকের বাবা অমল গাঙ্গুলিমশাই, তাঁর বাবা সুখেন্দুবিকাশবাবুও এমন ছিলেন— শুনেছি গৈরিকের কাছে।

প্যাকেট থেকে পোটাটো চিপস নিতে নিতে কাহিনী ঘোষ খুব মন দিয়ে বাইরেটা দেখছে। কেমন ছুটে যাচ্ছে পৃথিবী। এখন কদিন শুধুই ছুটি আর বেড়ানো।

পূষণ চিপস চাইতেই বকুনি দিল শুভ্রা, যাও, আগে মুখ ধুয়ে নাও। মুখ না ধুয়ে খাবে না।

তুমি তো গৈরিকের ছড়ার বইয়ের ছবিও করেছ না?

হ্যাঁ, একটা নয়, অনেকগুলো।

তাতে ওর মুখে মুখে বর্ণনা শুনেই—এঁকে ফেললে সব ছবি? পার্থ জানতে চাইল।

দেবু চুপ করে রইল। তার মনে পড়ল দু'দিন আগে গৈরিক ফোন করেছিল। গৈরিক তার ছেলে মেয়ে, বউ, মা নিয়ে আগে পৌঁছচ্ছে। সঙ্গে দীপংকর রায় আর তার ফ্যামিলি। ফ্যামিলি মানে ক্লাস নাইনে পড়া টুলকি আর টুলকির মা শুভ্রা। আর আসছে ঋতুপর্ণ বিশ্বাস। ঋতুপর্ণের ছেলে স্বপ্ন। স্বপ্নর মা কবিতা। ঋতুপর্ণরা আসবে বনগাঁ লাইনের গোবরডাঙা থেকে। ওদিকে বন্যা শুরু হয়ে গেছে। রোজই জল বাড়ছে যমুনা আর ইছামতিতে। খবরের কাগজে পড়েছে দেবু বেশ ভালোরকম বন্যা শুরু হয়েছে বসিরহাট, স্বরূপনগরে। বানভাসি মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে প্রাণ বাঁচাতে আশ্রয় নিচ্ছে স্টেশনে। গাছের মাথায়। স্কুল বাড়িতে।

জানলার বাইরে রোদমাখা আকাশ আর পৃথিবী দেখতে দেখতে দেবুর মনে হল কে বলবে এই রাজ্যেরই একটা দিক বন্যায় ভেসে যাচ্ছে। বসিরহাট-বনগাঁর অনেক গ্রামেই এবার দুর্গা পুজো হবে না। মানুষ ভাসছে। মাথার ওপর ত্রিপল, খাওয়ার জল, চিড়ে-গুড় কিছু নেই। আর একই রাজ্যের ভেতর এই পুরুলিয়ায় কোথাও বন্যার চিহ্নও নেই। হাওয়ায় বেশ গরম। চারপাশ কেমন খটখটে। শুকনো।

পূষণ দেখতে পেল তার হাতঘড়িতে এখন প্রায় নটা। বাংক থেকে নিচে নেমে জানলা দিয়ে বাইরে তাকাতেই পূষণ দেখল তার স্বপ্নে দেখা সেই দুটো খোকা-ডাইনো দিব্যি দৌড়চ্ছে ট্রেনের পাশাপাশি। ভালো করে নজর করলে বোঝা যাবে দুটো নয়, আরও অনেকগুলো ডাইনোসোরাস ট্রেনের কামরার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দৌড়চ্ছে। আর মাঝে মাঝে পূষণকে দেখে হাসছে।

ডাইনো! ডাইনো! ডাইনোসর! খুব জোরে চিৎকার করে উঠল পূষণ।

পূষণের পাশে বসা কাহিনী কিন্তু কিছু দেখতে পেল না।

শুভ্রা তাড়াতাড়ি ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, আবার চিৎকার করছ! দিনরাত কমিকস পড়ে পড়ে আর টি ভি দেখে দেখে ঘুমের মধ্যেও ওই সব। ব্যাটম্যান, সুপারম্যান, ফ্যানটম, গডজিলা, ডাইনোসোরাস।

পূষণ আবারও দেখতে পেল ট্রেনের পাশ দিয়ে অনেকটা উঁচু, লম্বা গলার ডাইনোসোরাসরা দৌড়ে বেরিয়ে গেল।

## ছোটকানা, বড়কানা

গাড়ি বরাভূম স্টেশনে ঢোকার আগেই দেবু বলল, কোনও চিন্তা নেই পার্থ, গৈরিক দলবল নিয়ে স্টেশনে থাকবে। খালি মালগুলো আমাদের হাতে হাতে নামিয়ে নিতে হবে। কারণ ট্রেন বেশিক্ষণ দাঁড়ায় না।

পূষণের ঘড়িতে এখন ঠিক নটা। কাহিনীর ঘড়িতে নটা দুই। ট্রেন প্ল্যাটফর্মে ঢুকে দাঁড়াতেই হই-হই করে নেমে পড়ল দেবু, শম্পা, পার্থ, শুভ্রা, পূষণ, কাহিনী। আরও অনেক লোক।

দেবু দেখল বেশ নিচু প্ল্যাটফর্ম। অনেকটা ফাঁকা আকাশ। স্টেশনের দুপাশে—লাইনের ওপর অন্য প্ল্যাটফর্মে দশ দিক আলো করা রোদ।

পূষণের পরনে জিনস্-এর ফুলপ্যান্ট, পায়ে ফিতে বাঁধা স্নিকার্স। পার্থর ব্লু জিনসের ফুল প্যান্টের ভেতর গোঁজা ফুল হাতা শার্ট। শার্টের হাতা কনুই অব্দি গোটান। দেবু টেরিকটের ফুল প্যান্টের ওপর বুক কাটা হাফ হাতা শার্ট পরেছে। পায়ে ফিতে বাঁধা শু্য। শুভ্রা শম্পা দুজনেই শালোয়ার-কামিজ। ফ্রক পরেছে কাহিনী। তার পায়েও ফিতে বাঁধা জুতো।

স্টেশনে দেবু, পার্থদের নিতে গৈরিক এসেছে। সঙ্গে ঋতুপর্ণ,

দীপংকর। আর আছে শম্ভু সিং সর্দার। গৈরিকের হাতে একখানা বড় লাঠি।

এই যে দেবুদা, এই দিকে। গৈরিক ডাকল।

ওই তো গৈরিক। পার্থ চলে এসো। দেবু বলল। তারপরই গৈরিকের হাতে লাঠি দেখে বলল, হাতে এটা কেন?

এইটো ডাং আইজ্ঞা। হাসতে-হাসতে বলল গৈরিক।

ঠিক আছে। ঠিক আছে। এখানকার ভাষায় ডাং মানে যে লাঠি বুঝলাম। কিন্তু সঙ্গে কেন? এখন তো মারামারি করবেন না।

না, তা নয়। এটা পৈতৃক সম্পত্তি দাদা। লাঠিটা বাবার ছিল। তাঁর থেকেই পাওয়া। বলরামপুর এলে লাঠি হাতে ছাড়া বাবা বেরতেন না। বিশেষ করে রাতে। বুনো-শুয়োর, পাগলা-কুকুর, দুষ্টু-মাতাল—সবাইকে ঠেকানোর জন্যে। ডাংয়ের মতো জিনিস নেই দাদা। বলতে-বলতে ডান হাতের মুঠোয় লাঠিটা আরও শক্ত করে চেপে ধরল গৈরিক। চেপে ধরতে ধরতে তার মনে হল সে যেন তার বাবা অমল গাঙ্গুলির হাত ধরে আছে। এটুকু ভেবে গৈরিকের চোখে জল এল।

শম্ভু সিং সর্দারের বয়েস পনের ষোল। তেমন লম্বা নয়, সুন্দর চেহারা। একটু লম্বাটে ভাঙা মুখ। শম্ভু দেবু পার্থদের অনেকগুলো মাল নিজের দু'হাতে তুলে নিল।

দেবুর পায়ে একটা পুরনো ব্যথা আছে। হাঁটতে কষ্ট হয়। আছে স্পন্ডিলোসিস। ছবি আঁকতে আঁকতে, ইলাসট্রেশন, মলাট করতে করতে ঘাড়ের ব্যথা আরও বাড়ে।

দেবুদা, ওই যে বড়কানা, ছোটকানা। আমাদের ছাদে উঠে ভালো করে দেখাব।

আপনার ছড়ায়, গল্পে তো বারবার এসেছে কানা পাহাড়ের কথা।

কি করব বলুন! গোটা ছোটবেলাটা যে এদের নিয়েই কেটে গেল। বাবার সঙ্গে বড়কানা, ছোটকানার মাথায় ওঠা। ট্রেকিংও বলতে পারেন। গাছ-পাথর, প্রকৃতি চেনা বলতে পারেন। সঙ্গে কিছু খাবার-দাবার, লাঠি, টর্চ, বন্দুক। আমরা কানায় চলেছি, বামনিতে। টুরগায়। পিকনিক হবে। মজা হবে। আমার ছোটভাই বুবু আছে। মা আছেন। সে খুব আনন্দের দিন দাদা। বলে বোঝাতে পারব না। আমার বাবা অমল গাঙ্গুলি এ সব ব্যাপারে সব

আগে। সকলের তিনি গুণ্ডা, নয়তো গুণ্ডাদা। বলতে-বলতে আবার নতুন করে জল চলে এল গৈরিকের চোখে।

ঠিক তখনই হলুদ রঙের দেয়ালওয়ালা একটা গুমটির ভেতর থেকে সিঙারা ভাজার গন্ধ উড়ে এল।

শুভ্রা বলল, আমি সিঙারা খাব।

বেশ তো খাবেন। বলেই গৈরিক শম্ভুকে বলল, তুই মাল নিয়ে এগিয়ে যা। বাড়িতে গিয়ে গুছিয়ে রাখ।

তারপর দীপংকর, ঋতুপর্ণদের সঙ্গে পার্থ দেবুদের আলাপ করাতে করাতে বলে উঠল, ইনি ঋতুপর্ণ বিশ্বাস—গল্প লেখেন, চাকরি করেন সাপ্তাহিক 'জয়ধ্বনি'তে। ইনি দীপংকর রায়—'মর্নিংসান'-এর সিনিয়ার রিপোর্টার। আর ইনি দেবব্রত ঘোষ—আর্ট ডিরেক্টর 'দৈনিক সময়'-এর। পার্থবাবু—পার্থ সেন পড়ান কলেজে।

দীপংকর বলল, আমি দেবব্রতবাবুকে চিনি।

একটু লাজুক হেসে দেবব্রত বলল, কেমন করে চিনলেন?

আপনার আঁকা ছবি, ইলাসট্রেশন তো 'দৈনিক সময়'-এর সম্পদ

দেবু খুব আলতো করে বলল, দুর মশাই! তারপর মাথা নিচু করে রইল।

শম্ভু ততক্ষণে মালপত্র নিয়ে লাইন পেরিয়ে ওদিকে চলে গেছে গৈরিক কাঁচা শালপাতার ঠোঙায় গরম গরম সিঙারা নিয়ে এসে বলল, নিন, খান।

শুভ্রা একটা সিঙারা তুলে নিয়ে বলল, ফ্যানটাসটিক। কি সুন্দর চারপাশ।

শম্ভুর হাতে হাতে যতটা মাল গেছিল, তারপর বাকিটা সবাই ভাগাভাগি করে ধরাধরি করতে করতে গৈরিকদের বাড়ি।

জানেন দাদা! গৈরিক বলল, শম্ভু ছেলেটা খুব বিশ্বাসী। একদম বাড়ির ছেলের মতো। আমি বা বুবু ফ্যামিলি নিয়ে এলে সব সময় সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। মা যদি একা আসেন, তো তাই। মাকে দিদি বলে ডাকে। বাবাকে ডাকত দাদা। আমার ছেলে আকাশকেও 'দাদা'-ই বলে। শম্ভুর বিশ্বাস আমার বাবা আবার ফিরে এসেছেন ছোট্ট আকাশ হয়ে। আকাশকে আদর করার

সময় সব সময় বলবে শম্ভু, ইটো আমার দাদা। ইটো আমার দাদা। শম্ভুকে যখন বাবা নিয়ে আসে আমাদের উত্তরপাড়ার বাড়িতে, তখন ও চার কি পাঁচ। কিন্তু ও থাকতে পারল না দাদা উত্তরপাড়ায়। ওর দম বন্ধ হয়ে আসে। বার বার পালিয়ে চলে যায় বলরামপুর। নিন, সিঙারা খান। ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। বড্ড বকছি বোধহয় আমি! মফস্বলের লোক তো—বলেই সিঙারায় বড় করে একটা কামড় দিল গৈরিক।

বরাভূম স্টেশন থেকে নেমে একটুখানি। এ বাড়িতে ঢোকার জন্যে দু-দিক দিয়েই রাস্তা আছে। ভেতর দিকে উঠোনে পেঁপেগাছ। গোটা তিনেক আখগাছ। কুমড়োলতা। সেই কুমড়োলতায় প্রজাপতি। একটা বড় কুমড়োও আছে। বেশ গভীর বাঁধানো একটা ইঁদারা আছে এ বাড়ির উঠোনে। কপিকল দিয়ে জল তুলে স্নান সেরে নিতে হয়। চমৎকার ঠাণ্ডা জল।

পার্থ, দেবু, শম্পা, শুভ্রা, পূষণ, কাহিনীরা একটু পরেই গৈরিক, মিলি, দীপংকর, শুভ্রা, কবিতা, ঋতুপর্ণ, স্বপ্ন, আকাশ, তিতলি, টুলকিদের সঙ্গে মিশে গেল। বড় স্টোভে চায়ের জল চড়েছে। রান্নাবান্নার দিকটা মূলত সামলে নিচ্ছেন শীলাদি। সঙ্গে কবিতা, মিলিরাও আছে। টুলকির মা শুভ্রা রায়ের শরীরটা একেবারেই ভালো নয়। কদিন আগে অ্যাকিউট অ্যান্ড সিভিয়ার প্যাংক্রিয়াটাইটিসে ভুগে উঠেছে। তারপর পেট কেটে গলব্লাডার অপারেশান। ফলে শুভ্রা রায় বেশ কাহিল।

দীপংকর, ঋতুপর্ণ, গৈরিক বাজার থেকে কোন জিনিস কতটা আনতে হবে শীলা আর মিলির কাছ থেকে বুঝে নিচ্ছে। খানিকটা দূরেই বাজার।

টুলকির মনে পড়ল পরশু সকালে এখানে আসার পর মিলি কাকিমা, শীলা পিসি, কবিতা কাকিমা, শম্ভুদাদা কি অসম্ভব পরিশ্রম করে এ বাড়ির তিনটে ঘর, রান্নাঘর পরিষ্কার করে ফেলল। সঙ্গে হাত লাগাল টুলকি, তিতলি, স্বপ্নরাও। ঝাঁট দেওয়া। ফিনাইল দিয়ে মোছা। কত যে ছুঁচোর নোংরা আর আরশোলার নাদি ছিল। মানুষজন না থাকলে যা হয়। শম্ভুদাদাও খুব খেটেছে। শম্ভুদাদা বলেছে, বনজারা পুতুল এনে দেবে ওকে আর তিতলিকে।

গৈরিককাকুদের বাড়ির কাছেই স্টেশনের গায়ে পড়েছে বনজারাদের তাঁবু। তাঁবুর কাছাকাছি গতকাল শম্ভুদাদার সঙ্গে একবার গিয়েছিল টুলকি আর তিতলি। বনজারারা তখন কেউ কেউ বাইরে বসে। তাদের তাঁবুর ছোট-

ছোট মুরগি ছানারা ঘুরে বেড়াচ্ছে এদিক-ওদিক। কি সুন্দর দেখতে। আর
ছিল লোমওয়ালা কুকুর।

চা খাওয়া হয়ে গেলে গৈরিক, ঋতুপর্ণ, দীপংকর বাজার চলল। সঙ্গে
দেবু। বাজার হেঁটেই যাওয়া যায়। হেঁটে গেলে মিনিট পনের। লিস্ট মিলিয়ে
মিলিয়ে জিনিস কিনছে দীপংকর. গৈরিক, ঋতুপর্ণ, দেবুরা। মিলি লিস্ট করে
দিয়েছে। আলু, পালংশাক, বেগুন. মুরগির মাংস। মাছের তেমন ভ্যারাইটি
নেই। কিছু কাটা পোনা, কাতলা আর ছোট সাইজের রুইয়ের বাচ্চা আছে
কাঁটার জন্যে যা বাচ্চারা একদম খেতে পারবে না।

আদা-পেঁয়াজ নিয়েছ গৈরিক? ঋতুপর্ণ জানতে চাইল।

হ্যাঁ, ঋতুদা। এবার চাল, চিনি, চা-পাতা বিস্কুট, নুন নিতে হবে।

ফেরার সময় এ-গল্প সে-গল্প। রাস্তার পাশে হাঁটাচলা করা মোরগদের
দেখিয়ে দেবু বলল, দেখেছেন, এখানকার মোরগ-মুরগিদের পা কতটা উঁচু
বিশেষ করে মোরগদের। রোগা, স্লিক চেহারা। হঠাৎ দেখলে ময়ূরের কথা
মনে পড়ে যায়। অবশ্য অতটা উঁচু নয় ময়ূরের মতো। কিন্তু কোথায় যেন
একটা মিল আছে।

আসলে ব্রিডটাই অন্য না। বেশির ভাগই তো লড়াইয়ের মোরগ
হাটবারে টাকা বাজি রেখে সাঁড়ার লড়াই। যে জিতল বাজির টাকাও জিতল
হেরে যাওয়া আধমরা মোরগটাও পেল। বলে গৈরিক বাজারের থলি
হাতে হাঁটতে থাকল।

বাড়িতে ফিরে গৈরিক দেখল তার ঠাকুর্দা সুখেন্দুবিকাশ গাঙ্গুলির
তৈরি বাড়ি কত বছর পর এত মানুষে গমগম করে উঠেছে। উঠোনে দড়ি
বেঁধে কাঠের তক্তা দিয়ে ছোট দোলনা তৈরি করেছে শম্ভু সিং সর্দার। সেই
দোলনায় চেপে পরপর দোল খাচ্ছে স্বপ্ন, আকাশ, তিতলি, টুলকি, কাহিনী
পূষণরা। আকাশে আশ্চর্য রোদ। চারপাশ সেই আলোয় হেসে উঠছে।

হঠাৎ পূষণ এগিয়ে এসে বলল, তোমরা কোথায় গেছিলে?

দীপংকর বলল, বাজারে।

কেন?

এই সব জিনিসপত্র কিনতে।

আংকল, এখানে ডাইনোসর আছে? ওয়াইলড এলিফেন্ট? পূষণ
জানতে চাইছে।
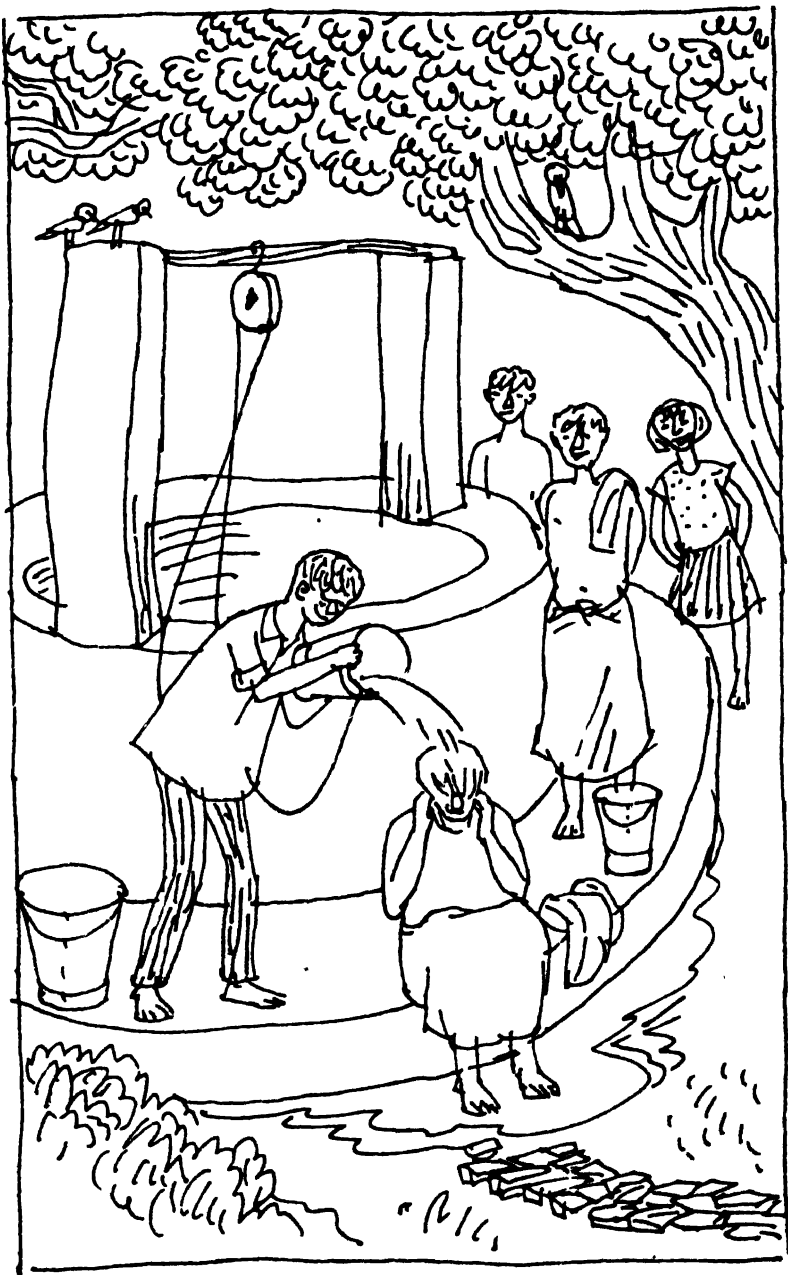
দীপংকর কোনও জবাব দিতে পারল না।

চায়ের কাপ নিয়ে ছাদে উঠে এলে বেশ রোদ লাগে। সেই রোদ্দুরে তাপ আছে। এখন প্রায় এগারোটা। দূরে—দিগন্তের দিকে তর্জনী তুলে গৈরিক বলল, ওই যে দেবুদা—বড়কানা। পাশে ছোটকানা।

দেবু তেমন করে স্পষ্ট কিছু দেখতে পেল না। আবছা মতো দুটো পাথরের স্তূপ আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে।

ওই দিকেই সাতবহিনী। হনুমাতা নদী। ধোপাবাঁধ। হনুমাতা নদীতে আমরা কতদিন চান করেছি। চান করেছি ধোপাবাঁধের জলে। তখন বাবা বেঁচে। বলরামপুরের সঙ্গে আমাদের নিয়মিত যোগাযোগ।

বাঁধ মানে তো বড় পুকুর। তুমি কাল বলছিলে গৈরিক! ঋতুপর্ণ জানতে চাইল।

হ্যাঁ। তাই তো। কাল আপনাদের বলরামপুর হাটে নিয়ে যাব। সেই রাস্তায় যেতেও দেখবেন একটা বড় বাঁধ পড়ে।

কানাপাহাড় না দেখেই কিন্তু আঁকলাম।

হ্যাঁ, দারুণ আঁকলেন। বলেই গৈরিক দেবুর দিকে তাকাল।

কিন্তু যতটা ফ্যাসিনেটিং আপনি বলেছিলেন বড়কানা, ছোট্‌কানা—ততটা কিন্তু লাগছে না।

সে যার যেমন লাগে দেবুদা। আমার তো ইচ্ছে একবার আপনাদের সবাইকে ওখানে নিয়ে যাই। বসি। গল্প করি। ছোটবেলায় বাবার সঙ্গে আমার বেড়ানোর জায়গা। কত স্মৃতি। নিজেদের পোষা অ্যালসেশিয়ানকে নিয়ে যাওয়া। যদি ডি এম ইউ ধরে বলরামপুর থেকে আমরা পুরুলিয়া যাই, পুরুলিয়ার ঠাকুর দেখার জন্যে, তা হলে পথে ছোটকানা বড়কানা পড়বে। ট্রেন থেকে দেখবেন কি দারুণ। অসাধারণ। উড়ো-মেঘ কখনও-কখনও লেগে থাকে বড়কানার মাথায়। সে এক দেখার মতো ব্যাপার।

বিকেলে আমরা কোথায় যাচ্ছি গৈরিক? দীপংকর জানতে চাইল।

অখিলকাকার বাগানে।

সেটা কোথায়? দেবুর জিজ্ঞাসা।

বেশ খানিকটা দূর।

হেঁটে যাওয়া যাবে না?

যাবে। ধান ক্ষেতের ভেতর দিয়ে আল ভেঙে একটা শর্টকাট আছে। মাঠে এখন ধান তো আছেই। সাপও থাকতে পারে। বলেই গৈরিক আবার বলল, চলুন নিচে যাই। বড্ড গরম লাগছে।

অখিলবাবুর বাগানে কি আছে? পার্থ জানতে চাইল।

অনেক বড় বড় গাছ। ফুল গাছ। সামনে অনেকটা ফাঁকা জায়গা। সেখানে দাঁড়িয়ে অসাধারণ সানসেট দেখা যায়। আমি বলরামপুরে এলে সাধারণত অখিলকাকুর বাগানের সামনে থেকে ওই সানসেটটা মিস করি না। মন ভালো হয়ে যায়। বাতাসে এতটুকু পলিউশন নেই। কোথাও কোনও শব্দ নেই। তার মাঝে সূর্য একটু-একটু করে ডুবে যাচ্ছে। একটা দিন ফুরিয়ে গেল। দূরে—অনেকটা দূরে টানা রেললাইন। সেখান দিয়ে খেলনা ট্রেন হয়ে ইঞ্জিন, বগিরা দৌড়ে যায়। ওই ট্রেন বিরামডি, নিমডি যাচ্ছে। আগে বিহারে ছিল নিমডি। এখন ঝাড়খণ্ডে।

তা হলে বিকেলে আমরা অখিলবাবুর বাগানে যাচ্ছি!

তাই যাব। পার্থর কথায় উত্তর দিল গৈরিক, কিন্তু পাঁচটার মধ্যে রেডি হয়ে বেরতে হবে। না হলে ঠিক সময়ে সূর্যাস্ত দেখা যাবে না। দীপংকরদা, আপনি সবাইকে একটু তাড়া দেবেন।

সবাইকে মানে তো মেয়েদের কথা বলছ গৈরিক! দেব।

চলুন, নিচে যাই। এখানে বেশ গরম লাগছে। বলে দেবু চায়ের কাপ-ডিশ হাতে উঠে দাঁড়াল। পেছন পেছন পার্থ।

ঠিক তখনই পূষণ, কাহিনী, আকাশ, স্বপ্ন, তিতলি, টুলকিদের আঁকা কাগজপত্র পেনসিল গুছিয়ে রাখছিল মিলি। বাইরের ঘরে চৌকির ওপর ছড়ান সব শাদাপাতা পেনসিল, রঙিনমোম প্যাসটেল। পূষণ আর কাহিনী এখন রেলগাড়ি রেলগাড়ি খেলছে। মুখ দিয়ে ট্রেনের শব্দ বার করছে পূষণ। সঙ্গে সঙ্গে কাহিনীও।

উঠোনে দোলনায় দুলছে স্বপ্ন। পাশে দাঁড়িয়ে আকাশ। আকাশের হাতে বাঁশের খেলনা-তির-ধনুক। শম্ভুদাদা তৈরি করে দিয়েছে। শম্ভুদাদা এবার সত্যিকারের কাঁড়বাঁশ—তির-ধনুক এনে দেবে এমন কথা দিয়েছে আকাশকে।

ইঁদারার জল এই অক্টোবরেও বেশ ঠাণ্ডা।

খালি গায়ে সাবান মেখে সিমেন্ট বাঁধান কুয়োতলায় চান সারছে

দীপংকর, গৈরিক, ঋতুপর্ণ। দীপংকর এই চানের নাম দিয়েছে ওয়াইলড স্নান। দড়ি বাঁধা ছোট বালতি করে কপিকল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে জল তোলা। তারপর সেই বালতির জল ঢেলে ঢেলে স্নান। হঠাৎই শম্ভু সিং সর্দার কোথা থেকে চলে এল। বলল, কাকাকে আমি নাহার।

কাকা মানে গৈরিক।

শম্ভু কুয়ো থেকে কপিকল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে জল তুলে গৈরিকের গায়ে মাথায় ঢালছে। একটা কাক দুটো শালিক একটু মন দিয়েই এই ছবি দেখছে। অক্টোবরের রোদ পড়েছে কুমড়োলতায়, পেঁপেগাছে। আখগাছের পাতায়।

শম্ভু তার বাবাকে চান করাচ্ছে দেখে তিতলি ছুটে এসে বলল, কিরে শম্ভু দাদা! আনলি না!

শম্ভু বালতিতে জল তুলতে-তুলতে বলল, হঁ-হঁ আইনব বুইন। আমার ইয়াদ আছে।

কুয়োর জল তুলে শম্ভু শুধু গৈরিককেই নয়, দীপংকর, ঋতুপর্ণদেরও চান করাচ্ছে। মানে গায়ে-মাথায় ঢেলে দিচ্ছে। রান্নাঘর থেকে শম্ভুর কথা শুনে শীলাদি বেরিয়ে এসে বলল, শম্ভু, বাইরে যাওয়ার আগে একবার আমার কথা শুনে যাবি।

শম্ভু বলল, হঁ শীলাপিসি।

ভিজে গায়ে কুয়োতলায় দাঁড়িয়ে গৈরিক দেখল মাথার ওপর সুন্দর রোদ মাখা আকাশ। দূরে কোথায় একটা পাখি ডাকছে। এরই মধ্যে দাঁড়িয়ে আমি —চল্লিশ পেরনো গৈরিক গাঙ্গুলি চান সারছি। শম্ভু সিং সর্দারের হাতের টানে কপিকলের লোহার চাকা ঘুরছে। বালতি বাঁধা মোটা প্লাস্টিকের দড়ি উঠছে। নামছে।

শম্ভু সিং সর্দারের ঠাকুর্দার সঙ্গে আমার ঠাকুর্দা সুখেন্দুবিকাশ গাঙ্গুলির পরিচয়। শম্ভু সিং সর্দাররা যে কমিউনিটির মানুষ, তাতে ওরা মনে করে যদি দোস্তি হয়, সাতপুরুষের দোস্তি হবে। দুশমনি হলেও সাতপুরুষের। ওদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ তিনপুরুষের। এখন শম্ভু কনট্রাকটারের আনডারে ভালো ইলেকট্রিক মিস্ত্রি। রঙচঙে জামার বুকপকেটে টেস্টার, ফিউজের সরু তার থাকে। রোজগার ভালো।

এসব ভাবতে-ভাবতে গায়ে সাবান ডলছিল গৈরিক।

শম্ভু তার হাত থেকে সাবান নিয়ে পিঠে মাখাতে থাকল।

কাল সকালে ডিংলাটো কাটব কাকা?

কাদের বাড়ির ডিংলা? গৈরিক জানতে চাইল।

এ বাড়ির। বলে শম্ভু গৈরিকের পিঠে সাবান ঘষায় মন দিল।

কাটবি। কাজে লেগে যাবে।

শীলাপিসি বইলছিল—

শীলা যখন বলেছে, আমায় আবার জিগ্যেস করছিস কেন?

ডিংলা মানে কুমড়ো। এ বাড়ির গাছে যে কুমড়োটা হয়ে আছে, শীলা সেটা কেটে রান্নায় লাগাতে চায়।

ভালো তো। মাথায় জল ঢালতে-ঢালতে গৈরিক আবারও কুমড়োলতার দিকে তাকাল।

ঠিক তখনই কাহিনীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ট্রেন-ট্রেন খেলতে-খেলতে পূষণ আবারও আঁকায় ফিরে গেল। মোম প্যাস্টেলে পূষণ খুব আস্তে-আস্তে তৈরি করে নিতে থাকল গডজিলা আর টিরানোসোরাস রেক্সের লড়াই। অনেকটা দূরে সেই ঘাস-পাতা খাওয়া সরু গলার তিনটে ডাইনোসর। যাদের রেলগাড়ির সঙ্গে প্রায় পাশাপাশি দৌড়ে আসতে দেখেছিল পূষণ।

এখানে খবরের কাগজ আসে, কিন্তু এ বাড়িতে খবরের কাগজের কোনও ব্যবস্থা রাখে নি গৈরিক। বেড়াতে এসে আবার খবরের কচকচি! দরকার নেই। একটা টি.ভি আনা হয়েছিল শীলা দেখবে বলে। সেই টি.ভি চলছে না। চলছে না মানে খুললেই ঝিরিঝিরি আলো। না শব্দ, না ছবি।

খুজান সিংয়ের দোকানে বাংলা খবরের কাগজ আসে। বাজার থেকে ফিরে কেরোসিন যোগাড় করার জন্যে খুজান সিংয়ের দোকানে গিয়ে বাংলা কাগজ দেখতে পেল গৈরিক, ঋতুপর্ণ, দীপংকর, দেবুরা।

খুজান সিং লিটার দুয়েক কেরোসিন যোগাড় করে দিতে পারল ব্ল্যাকে। এখানে খুব আকাল চলছে কেরোসিনের। স্টেশন ছাড়িয়ে রেললাইন পেরিয়ে খানিকটা গেলে খুজান সিংয়ের মুদিখানা। পাশেই একটা কুমোরের বাড়ি। সেখানে তৈরি হচ্ছে দেওয়ালির পুতুল। অন্য পুতুল। খুজান সিংয়ের মুদিখানায় চাল, ডাল, আলু, দেশলাই, মোমবাতি, সর্ষের তেল, কেরোসিন— সব পাওয়া যায়।

খুজানের বাবা ছিলেন প্রহ্লাদ সিং। তিনি বাঁকুড়ার মানুষ। বাঁকুড়া থেকে বলরামপুর এসেছিলেন ভাগ্যের খোঁজে। খুজানের দুই ছেলে বিমল সিং, শ্যামল সিং। তারাও দোকানে বসে। বয়েসে গৈরিকের কাছাকাছিই হবে। প্রহ্লাদ সিং গৈরিকের ঠাকুর্দা সুখেন্দুবিকাশ গাঙ্গুলি খুব ভালো করে চিনতেন।

অ, আপনারা গাঙ্গুলিবাবুর বাড়িতে এসেছেন?

খুজান সিংয়ের এই কথায় গৈরিক বলল, হ্যাঁ। আমি গাঙ্গুলিবাবুর নাতি।

তারপর অনেক কথা। স্বর্ণকার সম্প্রদায়ের মানুষ খুজানরা যখন বলরামপুরে এসেছিলেন, তখন কত ফাঁকা। এখন অনেক ভর্তি হয়ে গেছে। লোক বাড়ছে।

দোকান থেকে বাংলা খবরের কাগজটি নিয়ে ঋতুপর্ণ তার পয়লা পাতার হেডিংয়ে চোখ বোলাল। কাগজে লিখেছে ইছামতির জল ক্রমেই বাড়ছে। বারাসত, বসিরহাট, বনগাঁয় কোনও পুজোর আনন্দ নেই। বনগাঁ স্টেশনে গাদা গাদা বানভাসি মানুষ। কলকাতাতেও বৃষ্টির জলে নাকাল হচ্ছেন কলকাতার বাসিন্দারা। বৃষ্টির জলে ভেসে যাচ্ছে আনন্দ। পুজোর আলো, প্যান্ডেল, মাইক, মানুষের খুশি—সব ধুইয়ে দিয়েছে বন্যার জল। জল বাড়ছে গোবরডাঙার কাছে যমুনাতেও। এসব পড়তে পড়তে গা ছম-ছম করে উঠল ঋতুপর্ণর। আমাদের বাড়িতেও তো জল উঠতে পারে। যদিও আমাদের পাড়াটা বেশ উঁচু। কিন্তু বলা তো যায় না। নদীর জল, বন্যার তোড় কখন, কোথায় কি ভাসিয়ে দেয়।

চশমা চোখে মন দিয়ে ঋতুপর্ণকে খবরের কাগজ পড়তে দেখে গৈরিক বলল, ঋতুদা, আপনি বাড়িতে একটা এস.টি.ডি করুন। আপনার ভাই, ভাইয়ের স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলুন। তা হলেই সবটা জানতে পারবেন।

ঋতুপর্ণ একটু চুপ করে থেকে বলল, তাই করতে হবে।

দুপুরে জব্বর খ্যাঁটের পর একটু গড়িয়ে নেয়া। বিছানায় আধশোয়া হয়ে গৈরিক, দেবু, ঋতুপর্ণ, দীপংকর, পার্থ। ছোটরা তাদের নিজের নিজের মায়ের কাছে।

তোমরা এখানে এলে কীভাবে গৈরিক? দীপংকর জানতে চাইল।

আমরা—মানে ঠাকুর্দা এসেছিলেন। সুখেন্দুবিকাশ গাঙ্গুলি। তিনি গালার ব্যবসা করতেন। তখন পুরুলিয়ায় খুব গালার কারবার হয়। এখানে

দেখবেন এখনও রাজস্থান থেকে অনেক অনেক বছর আগে চলে আসা মুসলিম কমিউনিটির মানুষেরা সুন্দর সুন্দর গালার চুড়ি, আংটি, বালা--অন্য গয়না বানান। বানিয়ে তোলেন সিঁদুর কৌটো। কলম। সেখানে নিয়ে যাব আপনাদের। একেবারে প্রায় প্রিমিটিভ প্রসেস। আগুন, ডাইস, ব্লোপাইপ দিয়ে ফুঁ দেওয়া। মেয়েরাও তৈরি করেন ছেলেদের পাশাপাশি। তো ঠাকুর্দা গালার ব্যবসা করতেন। তিনি বন্দুক হাতে শিকারে যেতেন। নিজের বন্দুক ছিল। রাইফেল। মাটিতে দাঁড়িয়ে বাঘ মেরেছেন। বিগ গেমটা দাদা আমাদের রক্তে। বাবাও শিকার করতেন। এখন তো সব প্রহিবিটেড। তো আমার ঠাকুর্দা ভয়ানক দাপের লোক ছিলেন। বাবার সঙ্গে তাঁর প্রায় সময়ই পটত না। কারণ বাবাও খুব স্ট্রং পার্সোনালিটির মানুষ ছিলেন। আমার ঠাকুর্দা বাড়িতে চেন বেঁধে বাঘ পুষেছেন। ভাল্লুক পুষেছেন।

সে কি এ বাড়িতেই? পার্থ জানতে চাইল।

না, না, এ বাড়িতে নয়। ওই গালার কাজ দেখতে যাওয়ার সময় আপনাদের দেখাব, একটা সিনেমা হল আছে। ওইখানে আমাদের বাড়ি ছিল।

সিনেমা হলটাই? এবার দেবুর গলা শোনা গেল।

হ্যাঁ, তা বলতেই পারেন। ও বাড়িতে শুধু চেনে বাঁধা বাঘই রাখতেন না ঠাকুর্দা, ও বাড়িতে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুও এসেছিলেন। ভাল্লুকও থাকত ও বাড়িতে। এ বাড়িতেও ঠাকুর্দা ভাল্লুক রেখেছিলেন। তিনি বেশ ভালো কালি-কীর্তন গাইতে পারতেন। যে ছবির নিচে বসে কালি-কীর্তন করতেন, সেই ছবি এখনও দেখবেন বৈঠকখানার ঘরে টাঙান। এখন আর অমন ছবি কিনতে পাওয়া যায় না বাজারে।

তোমার বাবা তো বড় এনজিনিয়ার ছিলেন? দীপংকর জানতে চাইল।

তা তো ছিলেনই। খুবই বড় এনজিনিয়ার। তার সঙ্গে ফোটোগ্রাফার, শিকারী, প্রকৃতিপ্রেমিক। জীবন রসিক। আমাদের দুভাই, মা-কে নিয়ে তিনি প্রায়ই নতুন নতুন অভিযানে বেড়িয়ে পড়তেন। নতুন পাহাড়, নতুন জঙ্গল, নতুন ঝর্ণা, নদীর পাশে একদম না জানা একটা সুন্দর জায়গা। একটা সময়—ফর্টি সিক্স টিক্স হবে, তেভাগা মুভমেন্ট চলছে যখন, তখন কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে তাঁর ছিল গোপন যোগাযোগ। শোনা যায় বাবা অনেককে আর্মস ট্রেনিং দিয়েছেন ওই সময়।

বলতে-বলতে গৈরিকের হাই উঠল।

দেবু বলল, এবার একটু শুয়ে পড়া যাক।

দীপংকর বলল, এখনই না শুলে অখিলবাবুর বাগানে যেতে পারব না।

বাতাসে বেশ গরম আছে। আকাশে গনগনে সূর্য। কে বলবে আজ দুর্গাপুজোর ষষ্ঠী। বরাভূম স্টেশনের গা লাগোয়া একটা প্যান্ডেল। সেখানে ঠাকুর এসেছে। পাশে মেলা। ফুচকা, চাটের দোকান। ঝালচানা। এসব খবর এনে দিল শম্ভু সিং সর্দার।

তিতলি খুব রেগে গিয়ে বলল, শম্ভুদাদা, তোর কোনও কথার ঠিক নেই। এখনও এনে দিলি না বনজারা পুতুল। তিতলি অবশ্য এসব কথা খুব চেঁচিয়ে বলল না। শম্ভুদাদা শুধু তাকে আর টুলকিকেই এনে দেবে বনজারা-পুতুল। কথা দিয়েছে।

শম্ভু তাড়াতাড়ি বলল, আইনব বুইন, আইনব।

অখিলবাবুর বাগানে যাওয়ার রাস্তা বেশ অনেকখানি।

স্টেশন হয়ে, ধান খেতের মধ্যে দিয়ে আলপথ পেরিয়ে গেলে খানিকটা সুবিধে। তাড়াতাড়ি হয়, যাকে বলে শর্টকাট। সবার আগে শম্ভু সিং সর্দার। তার বাঁ-হাতে তিন সেলের বড় টর্চ। ডান-হাতে লাঠি।

সার বেঁধে যাওয়া।

ঋতুপর্ণ, পার্থ, দেবব্রত, দীপংকর, দুই শুভ্রা, শম্পা, কবিতা, তিতলি, টুলকি, স্বপ্ন, আকাশ। আকাশের ডান-হাত শক্ত করে ধরে আছে গৈরিক। এদের মধ্যে সবার ছোট আকাশ। মাঠ ভর্তি ধান গাছ। তার মাঝখান দিয়ে পায়ে চলা আলপথ। সেটা পেরিয়ে এলেই একটা বড় মাঠ। তারপর অখিলবাবুর বাগান।

মাঠে দাঁড়িয়ে গৈরিক পশ্চিমমুখ করে তাকাল। আকাশের গায়ে অনেক রঙের ছিটে। তার বেশির ভাগটাই লাল। কি আশ্চর্য রঙ। কতবড় ক্যানভাসে ছবি আঁকছে কোনও আর্টিস্ট! ভাবতে-ভাবতে চোখে জল এল গৈরিকের। লালের ওপর কালো-কালো বুটির ডিজাইন ছড়িয়ে পাখিরা ঘরে ফিরছে। চারপাশ কি আশ্চর্য শান্ত। অনেক-অনেক দূরে আবছা মতো কালচে পাহাড়ের সারি। নির্জন রেললাইন। এখানে দাঁড়িয়ে আবারও বাবাকে মনে পড়ল গৈরিকের। সঙ্গে-সঙ্গে বুকের ভেতরটা কি এক ব্যথায় মুচড়ে উঠল।

সূর্য এবার ছুটি নেবে। তার আলোয় কেমন যেন মন খারাপের সুর।

পূষণ বলল, ফ্যানটাসটিক।

স্বপ্ন বলল, দারুণ।

টুলকি চুপ করে তাকিয়ে রইল আকাশের দিকে।

তিতলিও। তারপর দুজনে-দুজনের দিকে তাকিয়ে, নিজেদের হাতের ভেতর হাত রেখে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

একটু দূরে একটা চ্যাটাল পুকুর। তেমন জল নেই। গভীরও নয়। সেই পুকুরের পাড় ধরে গোরুর পাল ঘরে ফিরছে। সামনে গোরু তাড়ান ছেলেটার খালি পা। খালি গা। হাতে একটা লাঠি। হ্যাঁ, তা হবে স্বপ্নর বয়েসি। ছেলেটা ওদের দেখে একগাল হাসল।

সঙ্গে-সঙ্গে ক্যামেরা বার করে ছবি তুলতে লাগল পার্থ। বসে, প্রায় শুয়ে পড়ে। দাঁড়িয়ে। নানা রঙের গোরুদের ছায়া পড়েছে পুকুর জলে। পার্থ শাটার টিপে যাচ্ছে।

একটু দূরে একা দাঁড়িয়ে দেবব্রত ঘোষ ভাবছিল, আর্ট কলেজে পড়ার সময় যেমন স্টাডিতে বেরতাম, স্কেচ করা, ছবি আঁকার জন্যে হারা-উদ্দেশ্যে যাওয়া। কোথাও পছন্দসই একটা স্টেশন দেখলে নেমে পড়া। ধর্মশালায় থাকা। সারাদিন ঘুরে-ঘুরে স্কেচ করা। কোথায় গেল সেই সব দিন! সেই স্বাধীনতা! ভাবতে-ভাবতে বড় করে শ্বাস পড়ল দেবুর।

বাচ্চারা নিজেদের মতো পুকুরপাড়ে গিয়ে জলে ঢিল ছুঁড়ছে। একসঙ্গে অনেকগুলো ঢিল। শুধু তিতলি আর টুলকি একটু দূরে দাঁড়িয়ে।

সূর্য পুরোপুরি ডুবে যায়নি। কোথা থেকে যেন খানিকটা মেঘের আড়াল নেমে এল সূর্যের মুখে। তারপর সেই মেঘ ফাটিয়ে দিয়ে সূর্যের আলো ফুটে উঠল আকাশের গায়ে। কি অসাধারণ তার রঙবাহার!

সবাই মুগ্ধ হয়ে সে-দিকে তাকিয়ে।

আচ্ছা গৈরিক, এই অখিলবাবু করেন কি?

দীপংকরদা, অখিলকাকা খুব বড় উদ্যানবিদ। বিদেশে যান মাঝে-মাঝেই। সেমিনারে পেপার পড়তে। বক্তৃতা দিতে। এই তো সেদিন জার্মানি ঘুরে এলেন। ওঁর গাছ, বীজ বাইরে যায়।

মানে দেশের বাইরে? ঋতুপর্ণ জানতে চাইল।

হ্যাঁ, বিদেশে। পশ্চিমবাংলার বাইরে তো যায়ই

ভদ্রলোক একাই থাকেন এই বাগানে?

না, দীপংকরদা, একা নয়। অনেকগুলো আদিবাসী ছেলে থাকে। বেশির ভাগই অরফ্যান।

ওঁর স্ত্রী?

ছিলেন। ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে।

ছেলেপুলে?

নেই দেবুদা। বাই রিলিজিয়ান অখিলকাকা খ্রিস্টান। বিয়েও করেছিলেন সেম কমিউনিটির মেয়েকে। কিন্তু বিয়েটা কেন জানি টিকল না। একসময় তো খুব ইনফ্লুয়েনসিয়াল ছিলেন। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় এসেছেন ওঁর এই বাগানে। এসেছেন। বসেছেন। সভা করেছেন।

বাইরে একটু-একটু করে অন্ধকার নামছে। রোদ লাগা পাহাড়ের চুড়োরা সেই অন্ধকারের আড়ালে ক্রমশ মুছে গেল।

গৈরিক বলল, চলুন, এবার ভেতরে যাই।

লোহার গেট ঠেলে ভেতরে ঢুকলে আশ্চর্য এক সবুজ গন্ধ পাওয়া যায়। চারপাশে সবুজ ছায়া। সবুজের খেলা। সে-দিকে তাকালে চোখ শান্তি পায়।

পাতাবাহার, ঝাউ, দেশি-বিদেশি ফুলের চারা। দেখতে-দেখতে গৈরিকের নজর পড়ল দুটি ছেলেকে নিয়ে কি একটা ফুলের চারার তদারক করছেন অখিলকাকা। কাছে এগিয়ে যেতে-যেতে গৈরিক টের পেল ফায়ার বলের পরিচর্যা হচ্ছে। আর আছে নানারকম ক্যাকটাস। আছে লিলি। ফায়ারবল ফুটবে ডিসেম্বরে, বড়দিনের সময়, গৈরিক জানে। কাকা, আমরা বলেই গৈরিক এগিয়ে গেল।

ও আলো! এসো এসো। কতদিন পড়ে এলে। বউদি কই?

মা আসতে পারেননি কাকা। পায়ে খুব ব্যথা জানেন তো! লাঠি ছাড়া এখন আর চলতে পারেন না। রিকশা থেকে নামতে হলেও রাস্তা বা মাটিতে একটা পিঁড়ি রাখতে হয়। চলাফেরায় খুব কষ্ট। কিভাবে যে নিয়ে এসেছি তা আমিই জানি। তবে মাঝে আরও খারাপ হয়েছিল। এখন নিজে-নিজে রেইকি করে আর হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় ভালো আছেন।
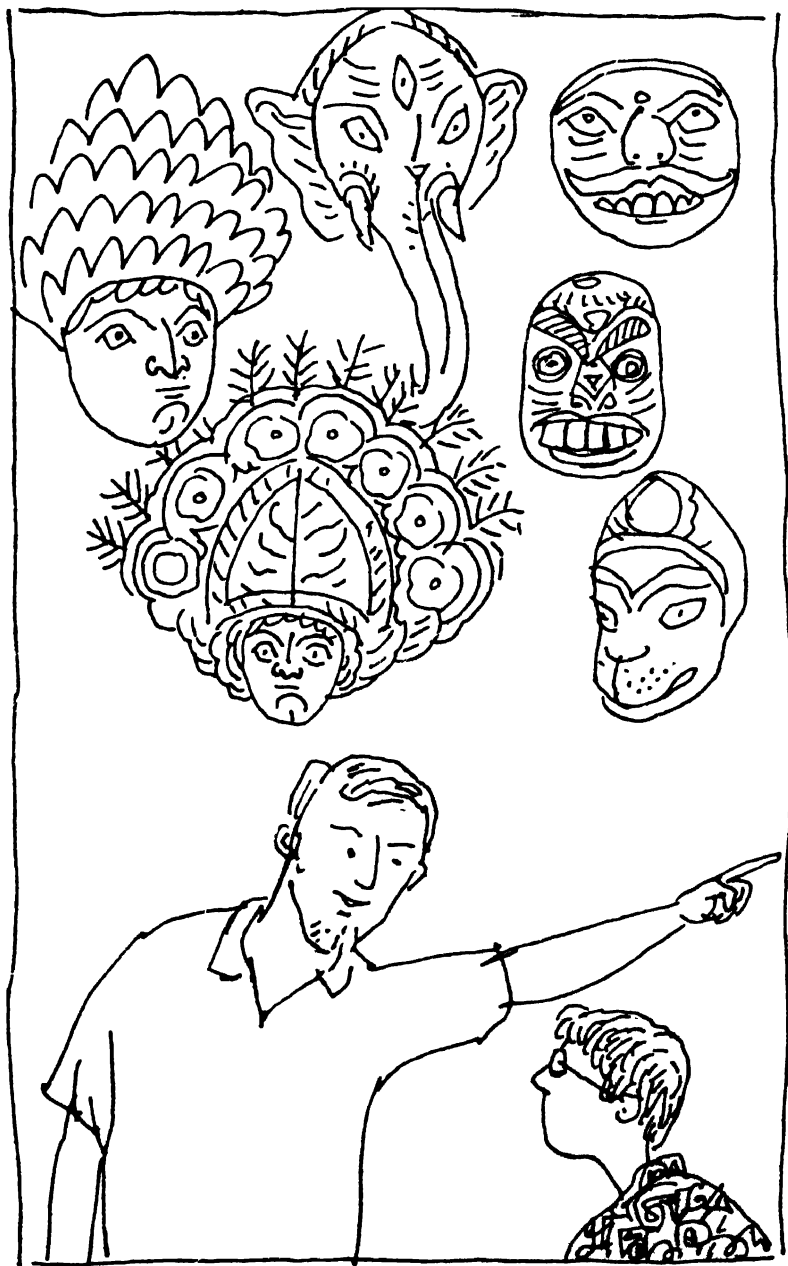
বউদি রেইকি নিজে করেন?

হ্যাঁ কাকা। নিজেই শিখে করছেন। সকালে ঘুম থেকে উঠেই বিছানায় বসে করেন।

উপকার পাচ্ছেন?

মনে তো হচ্ছে।

দেবু দেখল অখিলবাবু অনেকটা লম্বা। গায়ে এতটুকু চর্বি নেই। দাড়ি-গোঁফ কামান পরিষ্কার মুখ। গায়ের রঙ বেশ ময়লা। গলার স্বর সামান্য সরু।

ততক্ষণে আকাশে চাঁদ হেসেছে।

পরিষ্কার আকাশে চাঁদের আলো মাথার ভেতর কেমন যেন ঝিমঝিমে ভাব তৈরি করে দীপংকরের। শাদা জ্যোৎস্না নেমেছে গাছের সবুজ সবুজ পাতার ফাঁক দিয়ে-দিয়ে। সেই আলোয় মন ভালো হয়ে যায়।

কখন যেন চা নিয়ে এসেছে একটি ছেলে। স্টিলের কাপে-কাপে কালো চা। লেবু নেই। দুধ নেই। খালি লিকার আর চিনি।

বাগানের ভেতর চাঁদের আলোর নিচে দাঁড়িয়ে চা খাওয়ার মজাই অন্যরকম। চায়ের লিকারেও মিশে যাচ্ছে জ্যোৎস্না।

বাগানটা খুব গুছিয়ে করেন অখিলকাকা। বলেই গৈরিক তার হাতের বড় তিন সেল টর্চের আলো ছুঁড়ে-ছুঁড়ে দিতে লাগল গাছেদের পাতায়, মুখে। তারপর বলল, বাগান করতে-করতে একদম বিভোর হয়ে থাকেন। এত বিঘে জমির ওপর বাগান, দেখেশুনে রাখা, বীজতলা করা, সার দেওয়া, চারা তৈরি করে বড় করা, তারপর চারাকে বাড়াতে-বাড়াতে গাছ তৈরি করে ফেলা—এ বড় কম কথা নয়। তারপর সেই গাছের যত্ন করা। শুধু বড় করলেই তো হয় না। এসব ভাবতে-ভাবতেই গৈরিক ডাক দিল সবাইকে—চলুন, চাঁদের আলোয় বাগানটা একটু ঘুরে দেখি।

অখিলবাবু হঠাৎই প্রশ্ন করলেন, আলো, বউদিকে কি একা রেখে এলে?

না, শীলা আছে। হেমার মা আছে।

বেশ। বেশ।

আমরা বাগানটা একটু ঘুরে দেখি অখিলকাকা!

হ্যাঁ দ্যাখো, দ্যাখো। আর দ্যাখা হয়ে গেলে তুমি আমার সঙ্গে কথা বলে যেও আলো। একটা বিষয়ে একটু কথা বলব তোমার সঙ্গে।

ঠিক আছে। বলেই গৈরিক সবাইকে নিয়ে বাগানে ঢুকে গেল।

কি সুন্দর ঝকঝকে তকতকে বাগান। একটা শুকনো পাতা পর্যন্ত পড়ে নেই। বাগান করতে হলে এমন যত্ন করেই করতে হয়। ভাবতে-ভাবতে গৈরিক মাটিতে টর্চের আলো ফেলল। ব্যাটারি পোড়ান হলদেটে আলো পাতার সবুজে মিশে গিয়ে একটা অন্যরকম রঙ তৈরি করেছে।

খানিকটা এগোলে গাছ-গাছালির ফাঁকের মধ্যে একটা লম্বাটে জমি। চওড়াতেও অনেকটা। হঠাৎ দেখলে মনে হয় সুন্দর করে নিকনো। তকতকে। চাঁদের আলো আখপাতার ফাঁক দিয়ে চুঁইয়ে-চুঁইয়ে পড়ছে মাটির ওপর। সেই আলোর দিকে তাকিয়ে থাকলে ঘোর লেগে যায়।

এখানেই অনেকবার মিটিং হয়েছে। কলকাতা থেকে অনেক বড়বড় লোকজন এসেছেন এই বাগানে। বলতে-বলতে গৈরিক সেই ফাঁকা জায়গার ওপর টর্চের আলো ফেলল। তারপর একটু থেমে বলল, আমরাও এসেছি কতবার এই এখানে পিকনিক করতে, বাবার সঙ্গে।

একটু-একটু করে রাত বাড়ছে। নির্জন আকাশে অনেক তারা। ফুটফুটে চাঁদ। উথাল-পাথাল জ্যোৎস্নায় দশদিক ভেসে যাচ্ছে।

চলুন, পাশের ছোট বাগানটাও দেখে যাই। বলে গৈরিক সবাইকে তাড়া দিল। ওখানে এখন একটা হাসপাতাল হয়েছে লেপারদের। কুষ্ঠরোগীদের জন্যে কয়েকটা বেড। তবে বাগানটাও আছে।

বড় বাগান থেকে বেরনোর আগে অখিলবাবু তাঁর গেস্টরুমটা দেখাতে চাইলেন। ওঁর নিজের হাতে তৈরি রয়াল ছৌ অ্যাকাডেমি আছে। সেই ছৌনাচের দল নিয়ে তিনি দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ান। বাইরে থেকে পুরুলিয়ার ছৌয়ের ওপর কেউ গবেষণা করতে এলে থাকেন এই গেস্টরুমে।

বাগান থেকে বেশ খানিকটা উঁচুতে এই ঘর। লম্বা টানা দেয়াল। দেয়ালে দুর্গা, শিব, অসুর, সিংহ, কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, বাঘ— নানারকম ছৌয়ের জম-জমাট মুখোশ। ঘরের ইলেকট্রিক আলোয় সেইসব মুখোশরা জীবন্ত।

পার্থ জানতে চাইল, ছবি নেওয়া যাবে?

নিন না। ঘাড় নাড়লেন অখিলবাবু।

ফ্ল্যাশে কি ভালো আসবে! ন্যাচরাল লাইট নেই। বলতে-বলতে শাটার টিপল পার্থ। ঝলসে উঠল ফ্ল্যাশ।

এখানে ডাইনোসরের মুখোশ নেই কেন?

পূষণের কথায় একটু চমকেই উঠলেন অখিলবাবু। কি মনে হওয়াতে তিনি বললেন, সবাইকে ছোট বাগানটা দেখিয়ে ছেড়ে দিয়ে তুমি একবার আমার কাছে আসবে আলো?

দেবু খুব মন দিয়ে দেয়ালে টাঙান ছৌয়ের মুখোশদের দেখছে। পাশে দীপংকর। কি অসাধারণ কাজ। দেখতে-দেখতে দেবুর মনে হল।

ছৌয়ের মুখোশ দেখতে-দেখতে ঋতুপর্ণর আবার বন্যাভাসা বনগাঁর কথা মনে পড়ে গেল। কে-জানে বন্যার জল পুরো গোবরডাঙাই ভাসিয়ে দিল কিনা। ঘোজাডাঙায় কবিতার বাড়ির লোকজনরাই-বা কেমন আছে সব! ও দিকেও সব ভেসে গেছে। যেভাবেই হোক, ছোটভাইকে ফোন করে একটা খবর নিতে হবে। নিজের ভেতর এসব বলতে-বলতে ঋতুপর্ণ দেয়ালের মুখোশদের দিকে তাকিয়ে রইল।

গৈরিক তাড়া দিল, সবাই চলুন এবার। ছোটবাগানে যাব। তারপর ফেরা আছে।

পূষণ আবারও বলল, কই, ডাইনোসরের মুখোশ নেই তো এখানে!

গৈরিক বলল, সত্যিকারের ডাইনোসর আছে এই জায়গায়।

সত্যি।

হ্যাঁ, সত্যি।

দীপংকর বলল, পূষণ, তুই আজ ওয়াইলড কাউ দেখলি না?

কখন?

ওই-যে পুকুর পাড় দিয়ে দলবেঁধে যাচ্ছিল। যখন তোর বাবা ছবি তুলছিল।

রিয়েলি! ওরা ওয়াইলড কাউ আংকল!

গৈরিক বলল, হ্যাঁ।

অখিলবাবুর বড়বাগান থেকে বেরিয়ে সামনের ফাঁকা মাঠে থই-থই করছে চাঁদের আলো। পরিষ্কার আকাশে ভেসে থাকা চাঁদের গা থেকে গলে-

গলে নামছে জ্যোৎস্না। গোটা মাঠটাই জ্যোৎস্নায় বড় একটা রুপোর নদী। সেদিকে তাকিয়ে পূষণের মা শুভ্রা সেন গেয়ে উঠল—'চাঁদের হাসি বাঁধ ভেঙেছে। উছলে পড়ে আলো—'

সবাই গলা মেলাল তার সঙ্গে।

তারপর সেই গান ফুরিয়ে যেতে শুভ্রা আবার ধরল, 'আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে...'

বনে যাওয়ার মতো জ্যোৎস্নাই বটে। যদি একটা ছোট বাঘ বেরিয়ে আসত—মনে-মনে বলতে-বলতে গৈরিক গলা মেলাল সবাইয়ের সঙ্গে।

তখনই দূরে লাইনের ওপর দিয়ে ঝুগঝুগ-ঝুগঝুগ করতে-করতে একটা ট্রেন চলে গেল। সেই রেলগাড়ির কামরার সব আলো দূর থেকে একেবারে অন্যরকম দেখতে লাগছে।

সত্যি-সত্যি একটা ডাইনোসর যদি বেরিয়ে আসে এখন কোনও আড়াল থেকে পূষণের কথা মতো, ভাবতে-ভাবতে সবাইকে তাড়া দিল গৈরিক।

অখিলবাবুর ছোটবাগানটা পাশেই। সেখানে কুষ্ঠরোগীদের হাসপাতালে আছে। সেই বাগানে ঢোকা মাত্র একটা কুকুরের গলার গম্ভীর ডাক শোনা গেল। তারপর আর একটার।

জোড়া কুকুরের চিৎকারে সমস্ত বাগান গমগম করে উঠল।

অখিলবাবুর বড়বাগান থেকে যে-দুজন গৈরিকদের সঙ্গে এসেছিল, তারা তাড়াতাড়ি ভেতরে ঢুকে কুকুর দুটোকে চুপ করতে বলল।

এ বাগানেও পাতার ফাঁকে-ফাঁকে চাঁদের আলো। সেই আলোর ভেতর স্বপ্ন, আকাশ, পূষণরা একপাক করে দৌড়নোর চেষ্টা করতে গৈরিক রীতিমতো বকা দিয়ে উঠল। —অন্ধকারে সাপ থাকতে পারে।

গৈরিকের গলা শুনে ওরা থেমে গেল।

অখিলবাবুর ছোটবাগান থেকে বেরিয়ে গৈরিক শম্ভুকে বলল, সবাইকে নিয়ে বাড়ি চলে যেতে। অখিলকাকা তাকে কিছু একটা বলবেন বলে থাকতে বলেছেন।

শম্ভু সবাইকে নিয়ে এগিয়ে গেল। শুধু দীপংকর থেকে গেল গৈরিকের সঙ্গে ফিরবে বলে।

চাঁদের আলোয় নিজের বড়বাগানের গেস্টরুমের বারান্দায় মুখোমুখি
অখিলবাবু আর গৈরিক। পাশে দীপংকর।

গৈরিকের হাতে ডাং। তার লম্বা ছায়া পড়েছে বারান্দায়।

অখিলবাবু চুপ করে বসে।

গৈরিক জানতে চাইল, আপনি আমায় কি যেন বলবেন বলেছিলেন

ও হ্যাঁ! বলছি। আচ্ছা আলো, তোমার কি মনে হয় এই অঞ্চলে
কোনও দিন ডাইনোসর ছিল?

কেন, হঠাৎ একথা জিগ্যেস করছেন কেন?

ধরো পশ্চিমভারত, মধ্যভারত, দক্ষিণভারতে এর আগে ডাইনোসরের
ডিমের ফসিল পাওয়া গেছে। গোদাবরী অববাহিকায় পাওয়া গেছে
ডাইনোসরের আস্ত কঙ্কাল। এখন ধরো পুরুলিয়াও তো ভারতের আদিমতম
ভূমি গন্ডোয়ানা বেড বা ল্যান্ডের অংশ, যদি এখানে ডাইনোসররা ঘুরে
বেড়াত কোনও একসময়।

কি জানি। বলা কিছু যায় না। তবে এখানে এখন প্যাঙ্গোলিন বা
পিপীলিকাভূক কিছু আছে। গায়ে আঁশওয়ালা এই প্রাণীটি নেহাতই পিঁপড়ে
খেয়ে বাঁচে। মানুষ আবার একে শিকার করে মাংস খায়। এখন অবশ্য
প্যাঙ্গোলিন ধরা, মারা—দুটোই বারণ। কিন্তু সেসব কথা কে শোনে! আগের
কথার রেশ টেনে বলে গৈরিক, ডাইনোসরের কথা তো কিছু শুনিনি এ-
অঞ্চলে। বরং মেঘালয়ের শিলংয়ে ডাইনোসরের হাড়গোড় পাওয়া গেছে

সে তো নাগপুরেও পাওয়া গেল। ঠিক নাগপুরে নয়, নাগপুরের
কাছাকাছি পিসদুরার নন্দ-দঙ্গারগাঁওতে। শুধু ডাইনোসরের দেহের ফসিলই
নয়, এদের ডিম আর কঙ্কালের অংশও পাওয়া গেছে। আমি কাগজে কবে
যেন পড়লাম। এইসব ডাইনোসররা মূলত নিমগাছ, পেঁপেগাছ খেত।

একটু থেমে অখিলবাবু আবার শুরু করলেন, তুমি দ্যাখো আলো
সাড়ে চব্বিশ কোটি বছর আগে পারমিয়ন যুগে পৃথিবীতে এসেছিল
ডাইনোসররা। আঠার কোটি বছর ধরে রাজত্ব করার পর তারা ট্রায়াসিক
জুরাসিক, ক্রেটেসাস যুগ পার হয়ে টারসিয়ারি যুগের শুরুতে সাড়ে ছয়
কোটি বছর আগে মুছে গেল দুনিয়া থেকে। ষাট থেকে আটষট্টি কোটি
বছর আগে ছিল প্রিক্যামব্রিয়ন যুগ। সেইসময় পৃথিবীতে সমুদ্রের জলে সবে

মাত্র ব্যাকটেরিয়া- জাতীয় প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছে। তারপর এল ক্যামব্রিয়ন যুগ। সেইসময় পাওয়া গেল অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের।

দূরে কোথাও কুকুর ডেকে উঠল। একবার দুবার তিনবার।

একটু থেমে অখিলবাবু বললেন, এভাবে পর পর এল অরডোভিসিয়ন যুগ, সিলুরিয়ন যুগ, ডেভোনিয়ন যুগ। অরডোভিসিয়ন যুগে দেখা গেল মাছজাতীয় মেরুদণ্ডীদের। চোয়াল সমেত মাছ ও মাটিতে ছোট-ছোট গাছ এসে গেল সিলুরিয়ন যুগে। কীটপতঙ্গ ও উভচর প্রাণী আসতে শুরু করল ডেভোনিয়ন যুগে। কার্বোনিফেরাস যুগে এল সরীসৃপজাতীয় প্রাণীরা। তারপর শুরু হয়ে গেল পারমিনিয়ন যুগ। এইসময়ে দেখা গেল মোচাকৃতি গাছেদের। এই যুগেই ডাইনোসররা আসে, চব্বিশ-পঁচিশ কোটি বছর আগে। এর অনেক-অনেক কোটি বছর পর ক্রেটেসাস যুগ। সাড়ে তেরো কোটি থেকে সাড়ে ছয় কোটি বছর অব্দি।

এটুকু বলে চুপ করে রইলেন অখিলবাবু।

গৈরিক, দীপংকরের মুখে কোনও কথা নেই।

অখিলবাবু দেখতে পাচ্ছিলেন ডাইনোসরের-পাল তাঁর বড়বাগানের ভেতর ঢুকে পড়ে গলা, ঘাড় উঁচু করে-করে আমগাছের পাতা খাচ্ছে।

মেঘালয়ের পশ্চিমে খাসি জেলার ডিয়াংগ্রামে পাওয়া গেছে ডাইনোসরের ফসিল। তখন সেখানে সমুদ্র। সমুদ্রে বড়-বড় ঢেউ। ভাবো তো একবার।

একসময় সমুদ্র দূরে চলে গেছে। আবার কাছে চলে এসেছে। বছরের পর বছর এভাবেই চলেছে। ডিয়াংগ্রামে যে-সব ডাইনোসরের ফসিল পাওয়া গেছে তারা সবাই ডাঙায় থাকত। টুকরো-টুকরো হাড়ের যে ফসিল মিলেছে, তার সব থেকে বড় হাড় লম্বায় আশি সেন্টিমিটার। বাকিরা তিরিশ থেকে চল্লিশ সেন্টিমিটার। এখানে—মানে মেঘালয়ের পাহাড় এলাকায় যে সমুদ্র ছিল তা আরও বেশি বোঝা যায় শামুকের জীবাশ্ম পাওয়ার পর থেকে। কি আশ্চর্য এই পৃথিবী। এর কতই-না রহস্য। আমার তো কেবলই মনে হয় পুরুলিয়াতেও ছিল ডাইনোসররা।

আসলে ডাইনোসররা কেন যে হারালো পৃথিবী থেকে, এখনও কোনও স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাওয়া যায়নি। এই ধরুন না টিরানোসোরাস রেক্স—

ছ কোটি বছর আগে এরাই ছিল পৃথিবীর রাজা। লম্বায় পঁয়ত্রিশ ফুট। শুধু দুটি চোয়ালই দুফুট লম্বা। তারা হারিয়ে গেল কীভাবে? ব্যাপক উল্কাপাত? তুষার যুগ এসে যাওয়ায়? নাকি অন্য কোনও কারণ! ওভিরেকটাস নামে ডিমচোর সরীসৃপরা তখন ছিল পৃথিবীতে। যারা ডাইনোসরের ডিম চুরি করে পালাতো। ওভিরেকটাসদের মাথাটা ছিল সারসের মতো। দু চোয়ালে দাঁত। দু পায়ে হাঁটে। দুহাতে ধরে থাকত বিশাল আকারের ডিম। এরাই কি শেষ করে ফেলল ডাইনোসরদের! ভাবলে মাথাটা গুলিয়ে যায়।

টিরানোসোরাস রেক্সদের সময়েই ছিল উড়ন্ত ডাইনোসর টেরোড্যাকটিল। দুটি ডানা কুড়ি ফুট চওড়া। ছোটখাটো চেহারার এক একটা ডাইনোসরকে মুখে ধরে উড়ে যেত একশ-দেড়শ মাইল। শিকার ধরার সময় আক্রমণ করত ঝটতি। টেরোড্যাকটিলের চিৎকার শুনলে হাড় হিম হয়ে যাবে। মুখের ভেতর ধারাল দুসারি দাঁত। ভাবোতো, আমরা তিনজন বসে আছি। হঠাৎ গোটা দুই টেরোড্যাকটিল আকাশ থেকে নেমে এসে আমাদের এই তিনজনকে ছোঁ-মেরে নিয়ে চলে গেল।

কি যে বলেন অখিলকাকা! ছাড়ুন ওসব।

তুমি ভয় পাচ্ছ আলো?

না না, ভয় পাব কেন?

তা হলে! এমন তো হলেও হতে পারে।

ঠিক আছে, তাই নয় হল। কিন্তু আমরা একটু আপনার রয়াল ছৌ দেখব। মা আসবেন আপনার কাছে। এ ব্যাপারে কথা বলতে।

বেশ তো দেখবে। এসবই তো তোমাদের জিনিস।

তা হোক, মা আপনাকে এসে বলে যাবেন।

আরে দূর! শুধু এর জন্যে বউদিকে কষ্ট করে আসতে হবে না। একটা ফোন করে দিলেই হবে। শুধু তোমাদের দেখার দিনটা আর সময় দু দিন আগে জানালে সুবিধে হয়। অ্যারেঞ্জ করতে হবে তো। নাচিয়েদের খবর দেব।

ঠিক আছে। মাকে বলব আপনাকে ফোন করতে।

তাই বোলো।

অখিলবাবুর বাগান থেকে গৈরিক আর দীপংকর আস্তে-আস্তে বাইরে বেরিয়ে এল।
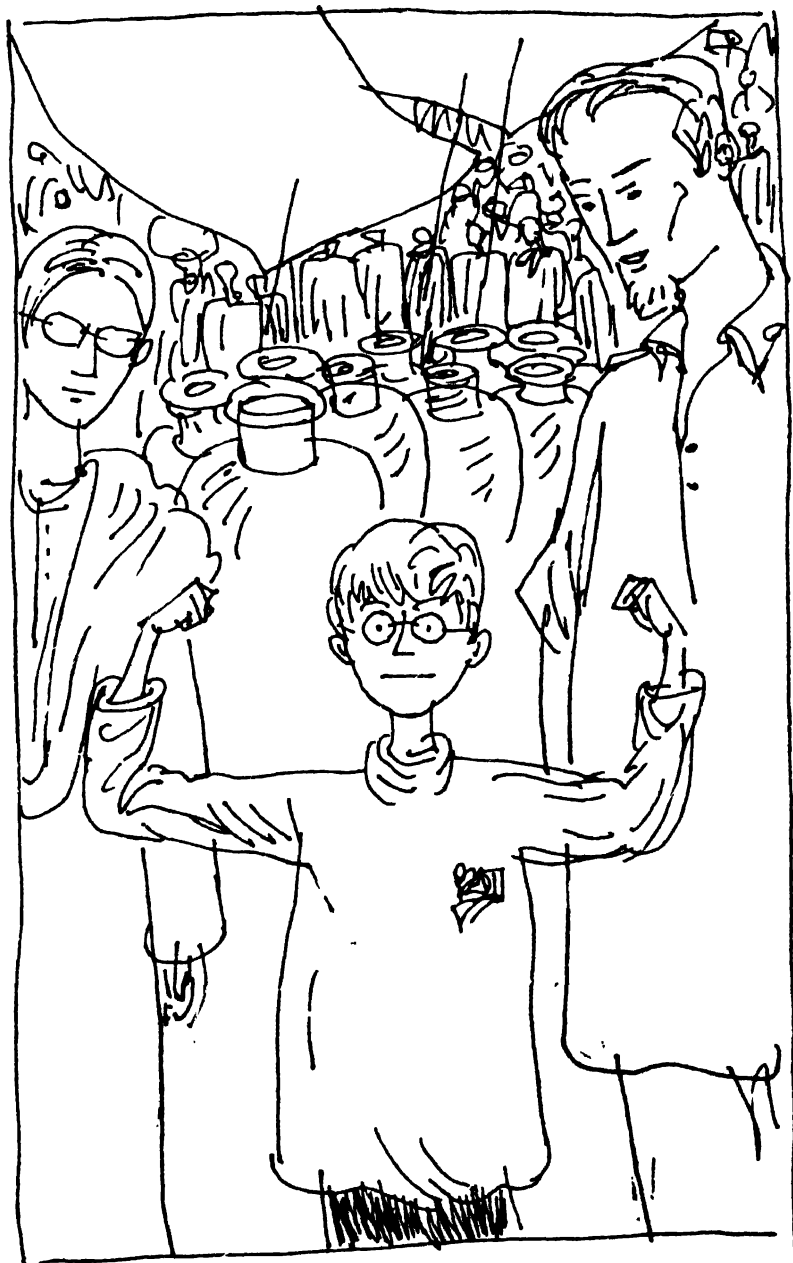
আজ তা-লে আসি অখিলকাকা!

এসো। এসো ভাই। আবার এসো।

গৈরিক দেখল লোহার বড় ভারি গেটের সামনে দাঁড়িয়ে অখিলকাকা।

সত্যি-সত্যি যদি টেরোড্যাকটিল এখন নেমে আসে আকাশ থেকে! তারপর ছোঁ মারে! একটা নয় একজোড়া। গৈরিক মনে-মনে সেই ছবিটা ভাবার চেষ্টা করল।

মাথার ওপর স্টেনলেস স্টিলের বড় রেকাবি হয়ে চাঁদ জেগে আছে। দূরে—যতদূর চোখ যায় শুধু চাঁদের আলো। পেছনে অখিলবাবুর বাগানে বড়-বড় সবুজ গাছের মাথায় ডালে পাতায় অনেক-অনেক আলোর ফুল। জোনাকি। কে যেন নিপুণ হাতে দেওয়ালির আলো জ্বেলেছে। চারপাশে কোথাও শব্দ নেই। কি মনে করে গৈরিক তার তিন ব্যাটারির টর্চের বোতাম টিপে দিল।

## বলরামপুরের হাট

আজ সপ্তমী।

কাল রাতে অনেক চেষ্টা করেও গোবরডাঙায় ঋতুপর্ণর বাড়ির লাইন পাওয়া যায়নি। খুবই দুশ্চিন্তায় ছিল ঋতুপর্ণ।

ভোর-ভোর উঠে দীপংকর, গৈরিক, ঋতুপর্ণ গিয়ে এস.টি.ডি বুথ থেকে ঋতুপর্ণর বাড়ি ফোনে ধরল।

জল অনেকটাই বেড়েছে। একেবারে বাড়ির লেভেলে। ফোন নামিয়ে বলল ঋতুপর্ণ।

আর একটু হলেই বাড়িতে বন্যার জল ঢুকে যাবে। কি যে হবে তখন! ওদের বলেছি, সব মাল ধরাধরি করে ছাদের ঘরে তুলে দিতে। কিন্তু অত মাল ওপরে টেনে তোলা কি সম্ভব! কে তুলবে? বলতে-বলতে বড় করে শ্বাস ফেলল ঋতুপর্ণ।

রেল স্টেশনের গায়ে প্যান্ডেলে ঢাক বাজছে। সঙ্গে মাইক। সকাল থেকেই সপ্তমী পুজোর আয়োজন। চানে যাবে কলাবউ। এস.টি.ডি বুথ থেকে ফেরার পথে ঠাকুরের প্যান্ডেলের সামনে দাঁড়াল দীপংকর। প্রতিমার মুখের আদলে ছৌয়ের মুখোশ যেন। দুর্গা, কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, অসুর—সবাই।

বাড়ি ফিরে গৈরিক তাড়া দিল। যারা বলরামপুর হাটে যাবে রেডি হও।

খানিক পরেই একপশলা বৃষ্টি। তারপরই ঝকঝকে রোদে চারপাশ একেবারে অন্যরকম।

মেয়েরা রিকশায় যাবে বলরামপুর হাটে। বাচ্চারাও। ছেলেরা পায়ে হেঁটে।

আজ মঙ্গলবার। দুর্গা সপ্তমী। সেদ্ধ ভাত খেয়ে বলরামপুর হাটে রওনা হতে-হতে এগারোটা বেজে গেল। গৈরিক মিলিকে বলল, তুমি বউদিদের আর ছোটদের নিয়ে হাটের বাইরে দাঁড়াবে। আমরা পৌঁছলে সবাই একসঙ্গে ঢুকব।

আচ্ছা। বলে মিলি ঘাড় নাড়ল।

রাস্তার অবস্থা বেশ খারাপ। তারপর বৃষ্টি হওয়ায় যথেষ্ট কাদা। তার মধ্যে লরি, টু হুইলার, সাইকেল রিকশা, সাইকেল, পুজো দেখার ভিড়।

গৈরিক, হাট কটা থেকে বসে? দেবু জানতে চাইল।

দশটা থেকেই বসে যায় দাদা।

তা কতক্ষণ লাগবে যেতে?

জোরে হাঁটলে এক ঘণ্টা।

হাটের রাস্তায় যেতে ডানদিকে পুজো প্যান্ডেল। সেখানে ঠাকুর। জুতো পরে প্রতিমার সামনে যাওয়া যাবে না।

প্রতিমা দেখে দেবু বলল, একদম ছৌয়ের মুখোশ বসানো সবার মুখে। দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ, কার্তিক—সবই যেন ছৌ-নাচের মুখোশ পরে দাঁড়িয়ে। মাথার মুকুটও ওই ডিজাইনের। অসুরের মুখও তাই। গণেশের হাতেও তির-ধনুক। কার্তিকের হাতে তো তির-ধনুক থাকেই। কিন্তু গণেশের হাতে ধনুর্বাণ আগে কখনও দেখিনি। নিজের মনে-মনে এটুকু বলে দেবু আবারও প্রতিমার দিকে তাকালো। একচালির ঠাকুর। পেছনে চালচিত্র আছে। গণেশ আর কার্তিক—দুজনেই ধনুক-বাণ তাক করে আছে অসুরের দিকে। পার্থ অনেকবার ক্যামেরার শাটার টিপল ঠাকুরের দিকে লেনস রেখে।

ঠাকুর দেখে আবার হাঁটা।

চলতে-চলতে গৈরিক বলল, একটু এগোলেই বড় একটা বাঁধ। তারপর আরও খানিকটা হাঁটতে হবে।

বলরামপুরে এসে অনেকগুলো নতুন কথা শিখলাম—বলল দীপংকর।

কিরকম? জানতে চাইল গৈরিক।

এই ধরো—ডিংলা মানে কুমড়ো, ভাইলছে মানে দেখছে, টেঁকলম মানে ঘিরে ধরলাম।

হুঁ দাদা। ই সব পুরুল্যার ভাষা বটেক। বলে হো-হো করে হাসল গৈরিক, আপনি টেঁকলম বলতে মনে পড়ল। বাবার সঙ্গে একবার রাত করে ফিরছি গাড়িতে। পথে কাটা গাছের গুঁড়ি ফেলে আমাদের টেঁকতে চেয়েছিল বহু বছর আগে। তারপর বাবা রাইফেল হাতে গাড়ি থেকে নামতেই চেনা লোক একজন এগিয়ে এসে বলল, বাবু, তু বটে!

বাবা বলল, হুঁ। এখানে একটা ডাকাতদের গ্রামই আছে।

বলে গৈরিক শব্দ না করে হাসল। তারপর বলল, কেন, আর একটা কথাও আপনি শিখেছেন।

কি? জানতে চাইল দীপংকর।

ডাং। ডাং মানে লাঠি।

হ্যাঁ। হ্যাঁ। ঠিক বলেছ।

এই হাটে, জানেন তো দাদা, আমাদের ছোটবেলায় টাট্টুঘোড়া আসত বিক্রির জন্যে।

এখনও আসে? দেবু জানতে চাইল।

না, না। বহুদিন আসে না।

যাওয়ার সময় রাস্তার ধারের দোকান থেকে খানিকটা মিছরি কিনল গৈরিক। এমনি মিছরি নয়। সর্দারজিদের রেস্টুরেন্টে খাওয়ার পর বিল মেটানোর সময় মউরি, টুথপিকের সঙ্গে এই মিছরিও সাজিয়ে দেয় প্লেটের ওপর। দেখতে অনেকটা যেন কাচের ছোট-ছোট টুকরো।

এই-যে দাদা বাঁধ।

দীপংকর শিখেছে বাঁধ মানে বড়পুকুর। সেই বড়পুকুরের পাশে উঁচু মাটির পাড় ধরে হেঁটে যাচ্ছে দলবাঁধা মোষেরা। তা সাত-আটটা তো হবেই।

পার্থ তার ক্যামেরায় শাটার টিপে ছবিটা ধরে রাখতে চাইল।

হাটে ঢোকার মুখেই অনেক প্রাচীন একটি বট। তার পায়ের নিচে

এদিক-ওদিক ছড়ান বড়-বড় পাথর। সেখানেই দুই শুভ্রা, কবিতা, মিলি, তিতলি, টুলকি, শম্পা, কাহিনী, স্বপ্ন, আকাশ, পূষণরা দাঁড়িয়ে। সবাই মিলে তারপর হাটের ভেতর।

বেলা বারোটা-সাড়ে বারোটায় জম-জমাট বলরামপুরের হাট। কি নেই হাটে! নতুন ঝুড়ি, মাটির হাঁড়ি-কলসি, ঝালচানা, দিশি সাবান। গয়ার রঙিন গামছা, চাদর নিয়ে বসেছে কেউ।

দীপংকর দর করল। গয়ার গামছা একটা পঁচিশ টাকা। পোড়ামাটির বড় হাঁড়ি দশ টাকা। মাঝারি ছয়।

সমুদ্র-কাঁকড়ার তেল বিক্রি হচ্ছে। পাওয়া যাচ্ছে উকুন মারার, ছাগলের গায়ের পোকা মারবার বিষ, ওষুধ। খাটিয়ার ফ্রেম, দড়ি--সব পাওয়া যাচ্ছে। এসেছে ঝালদার বঁটি। তার বাঁটটিও লোহার। হাটে বিক্রি হচ্ছে মোষ, গোরু, ছাগল, মোরগ, খাসি। শুয়োরের মাংস পাওয়া যাচ্ছে একদিকে। তিরিশ টাকা আর পঁয়ত্রিশ টাকা কিলো—দুরকম দাম। আছে সত্যিকারের তিরের ফলা। কাটারি, খন্তা, ছুরি। তালপাতা, বাঁশের ছিলকা দিয়ে তৈরি নানারকম জিনিসপত্র রাখার পাত্র।

এককোণে গোহাটা। সেখানে গোরু মোষ। হাটের বাইরে ভাগা দিয়ে মাংস নিয়ে বসেছে কেউ-কেউ। শালপাতার ওপর শুকনো রক্ত, মাছি। পাশে বঁটি। আসবার সময় দেখেছে গৈরিকরা।

পার্থ পর পর ছবি তুলে যাচ্ছে।

গৈরিক হঠাৎ পকেট থেকে মিছরির প্যাকেট বার করে চার-ছটা করে মিছরির ক্রিস্টাল সবার হাতে-হাতে ধরিয়ে দিতে লাগল। ছোটরা হাত পেতে নিচ্ছে। তাদের মায়েরাও।

মাথার টুপি ঠিক করতে পূষণ বলল, কি! কি! এটা?

গৈরিক গম্ভীরভাবে বলল, ডাইনোসরের ডিমের টুকরো।

সত্যি! ডাইনোসরের ডিমের টুকরো। আমায় দাও। আমায় দাও। —বলতে-বলতে পূষণ তার ডানহাত পাতল।

ওর হাতে বেশ কয়েকটা মিছরির টুকরো দিল গৈরিক।

খাব? পূষণ জানতে চাইল।

গৈরিক বলল, খেয়ে ফেল।

তাড়াতাড়ি টুকরো মিছরি মুখে ফেলে পূষণ বলল, ও দারুণ! দারুণ! আমায় আট্টু দাও।

গৈরিক আরও কয়েকটা টুকরো দিল ওর হাতে।

তাড়াতাড়ি মুখে ফেলে পূষণ চুষতে লাগল।

কেমন লাগছে ডাইনোসরের ডিমের টুকরো? দীপংকর জানতে চাইল।

খুব ভালো। খুব ভালো। ওফ্! ডাইনোসরের ডিমের টুকরো খুব ভালো লাগছে। শক্তি পাচ্ছি। গায়ে শক্তি পাচ্ছি। বলে বেশ জোরেই চেঁচিয়ে উঠল পূষণ।

আঃ পূষণ! হাত ধরো। বলল শুভ্রা সেন।.

গল-ব্লাডার অপারেশন আর প্যাংক্রিয়াটাইটিসের ক্লান্তি নিয়ে শুভ্রা রায় আস্তে-আস্তে হাঁটছে। পাশে মিলি. কবিতা, শম্পা।

শক্তি পাচ্ছি। আমি শক্তি পাচ্ছি। বলেই পূষণ পায়ে ভর দিয়ে গোল হয়ে একপাক ঘুরে নিল।

আর খাবি ডাইনোসরের ডিমের টুকরো? গৈরিক জানতে চাইল।

দাও। হাত পাতল পূষণ।

এখানেও শাহরুখ খান, রানি মুখার্জি, হৃত্বিক রোশন? বলে টুলকি তিতলিকে ডেকে আঙুল দিয়ে দেখাল।

কোথায়, কোথায় টুলকি দিদি? জানতে চাইল তিতলি।

ওই তো, গাছের গায়ে!

তিতলি দেখল হাটের মধ্যে একটা বড় বটগাছের গায়ে অনেক ফিলমস্টার একসঙ্গে হাওয়ায় উড়ছে। মাথার ওপর রোদ খুব চড়ে গেছে। গরম লাগছে বেশ। ঘামতে-ঘামতে গৈরিক বলল, এবার ফিরতে হবে।

## টুরগা, বামনি

একটা জিপ আর একটা অ্যামবেসাডার ভাড়ায় নিয়ে গৈরিকরা গেল অযোধ্যা পাহাড়। সে-এক লম্বা সফর। অযোধ্যা পাহাড়ের মাথায় ফুটবল খেলার মাঠ আছে, ঘরবাড়ি,. হোটেল, চায়ের দোকান—না দেখলে বিশ্বাস হয় না।

অযোধ্যা পাহাড়ের মাথায় মাছ-ভাত, ডিমের ঝোল-ভাত খেল

গৈরিকরা। ফেরার পথে চড়িদার মোড়ে নেমে মুখোশের পাড়ার ভেতর ঢুকল। তার আগে চড়িদার মোড়ে গরম রসগোল্লা, চা খেয়ে নেওয়া।

চড়িদার মুখোশের কত না বাহার। বাঘ, হরিণ, শিব, দুর্গা, অসুর, রাক্ষস, সাঁওতাল ছেলে, সাঁওতাল মেয়ে।

অযোধ্যা পাহাড়ের ওপর উঠে মনেই হয়-না আসলে এটা পাহাড়। কিন্তু ওঠার সময় টের পাওয়া যায়। অযোধ্যা পাহাড় যাওয়ার আগে টুবগা ফলস হয়ে এসেছে গৈরিকরা।

কি সুন্দর! কি সুন্দর টুরগা—কিছু বলার নেই।

সরু পাথুরে রাস্তার ওপর জিপ দাঁড়াল। সেখান থেকে সরু পাহাড়ি পথ ধরে অনেক, অনেকখানি নিচে নেমে যাওয়া

পথের দুপাশে চিহড়লতা, নানারকম ফার্ন, বুনো গাছ। গাছের পাতারা অনেক-অনেক বেশি সতেজ আর সবুজ।

আজ খুব রোদ। বাতাসে গরম আছে। কিন্তু পাথর বেয়ে টুরগার কাছে যেতে পারলে জলের গুঁড়ো মেশান ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা হাওয়ায় বেশ আরাম লাগে।

পেটে সবে গল ব্লাডার অপারেশন হওয়ার সেলাই। তাই শুভ্রা রায় নিচে নামেনি। মিলিও না। শুভ্রা আর মিলি ওপরে বসে রইল চুপচাপ।

অনেকটা নিচে পাথর থেকে পাথরে জল পেরিয়ে, সাবধানে ওরা সবাই গিয়ে দাঁড়াল। অনেকটা উঁচু থেকে জল পড়ছে। সেই জল দ্রুত স্রোত হয়ে নেমে যাচ্ছে নিচে। আরও নিচে।

কি যে ভালো লাগছে টুলকি, তিতলি, স্বপ্নদের। আকাশ, কাহিনী, পূষণ তাদেরও দারুণ লাগছে। অনেকটা ওপর থেকে যে-জল পাথরের ওপর আছড়ে পড়ছে, তাকে ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে টুলকির। কিন্তু উপায় নেই। গৈরিককাকু বারবার বলছে, খুব সাবধান, চারদিকে পেছল-পেছল পাথর আছে। সাবধানে উঠবে-নামবে।

চারপাশ থেকে কি সুন্দর গন্ধ আসছে। এই গন্ধকেই কি বনের গন্ধ বলে? ক্লাস নাইনের টুলকি বুঝতে পারছিল না। কাহিনীর খুব ভালো লাগছে চারপাশটা। কাহিনী আড় চোখে-চোখে দীপংকর জ্যেঠুর দিকে দেখছিল। কি জানি, জ্যেঠু এখনই হয়তো বলে বসবে—এই যে দেবুর মাইয়া। কি

কও! আমাকে দেবুর মাইয়্যা বলে জ্যেঠুটা। আর পূষণকে পার্থর পোলা। কথাটা ভেবেই হাসি পেল কাহিনীর। ভাবতে-ভাবতে হেসেই ফেলল কাহিনী।

এখানে কি ডাইনোসর আসতে পারে? পূষণ তার চোখের চশমা ঠিক করতে-করতে গৈরিককে জিগ্যেস করল।

আসতে পারে। নিশ্চয়ই আসতে পারে পুশ-অন। বলে দীপংকর তার হাতের লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়াল।

পুশ-অন! বাঃ, নতুন নাম হল পূষণের। বলে স্বপ্ন হালকা করে হাসল।

পূষণের মনে পড়ল জুরাসিক পার্কে ঢোকার আগে এরকমই একটা ঝরনা ছিল।

তখনই পার্থ সবাইকে লাইনে দাঁড় করিয়ে পর-পর অনেকগুলো ছবি তুলল।

বুনো চিহড়লতার একটি পাতা ছিঁড়ে ঠোঙা বানালো ঋতুপর্ণ। তারপর টুরগার ঝরনা থেকে খানিকটা টলটলে জল তুলে আস্তে- আস্তে ওপরে উঠে এল।

টুলকি তিতলি পূষণ আকাশ স্বপ্নদের ইচ্ছে করছে না টুরগা ছেড়ে যেতে।

পুশ-অন—চলো। বলে দীপংকর পূষণকে ডাকল।

গৈরিক বলল, দীপংকরদা, পাথর বেয়ে ওঠার সময় জুতোটাকে যতটা পারবেন পাথরের খাঁজের মধ্যে ঢুকিয়ে দেবেন। এতে হবে কি শেওলায় পা পিছলোবে না। পাথরের মুখে শ্যাওলা জমে। তাছাড়া বডি ওয়েটে আলগা পাথর খুলে যেতে পারে।

নামায় তেমন পরিশ্রম নেই। ওপরে ওঠাটা বেশ কষ্টের। নিজের পায়ের নিচে মাঝে মাঝেই পাথর সরে যাওয়া টের পাচ্ছে দীপংকর।

গৈরিক, বাচ্চাগুলো সবাই সাবধানে উঠছে তো! ঋতুপর্ণ জানতে চাইল।

আপনি উঠে যান ঋতুদা। সবাই ঠিক আছে। বলে গৈরিক ওপরে উঠতে লাগল।

নিচে এতক্ষণ টুরগার জলছোঁয়া হাওয়া গায়ে লাগায় বেশ আরাম হচ্ছিল। এখন যত ওপরে ওঠা যাচ্ছে, তত রোদ গরম আর ঘাম। হাতে করে চিহড়পাতায় আনা টুরগার জল শুভ্রা আর মিলিকে দিল ঋতুপর্ণ।

এবার ফেরার পালা।

গৈরিক বলল, বামনিতে এখন তেমন জল নেই। টুরগার যা আনন্দ হয়েছে, বামনিতে হবে না।

বাড়ি ফিরে তাড়াতাড়ি কাগজ আর মোম প্যাস্টেল নিয়ে বসল পূষণ। তার মনের ভেতর টুরগার যে ছবিটা ছিল, তা তাড়াতাড়ি নামিয়ে আনল কাগজের গায়ে। শুধু বড় পাথরের আড়াল থেকে একটা ফাজিল ডাইনোসর মজার মুখ করে উঁকি দিচ্ছিল পূষণের ছবির ভেতর।

তুই শম্ভুদাদা, ঠিক কথা বলিস না। এনে দিলি না আমার বনজারা পুতুল।

আরে ওতো আমি অর্ডার দিয়েছি বুইন, হঁ। সে আমি এনে দিব। তোরা যাবি তো রাবণ পুড়্যা দেইখতে?

সে-তো দেরি আছে দশমীর দিন রাতে। ঠাকুর ভাসানের পর।

আমি নিয়ে যাব তোদের। বলেই শম্ভু উধাও হয়ে গেল।

টুলকির মনে হল দেখতে-দেখতে বিজয়া দশমী এসে যাবে। কেমন কটা দিন কেটে গেল বলরামপুরে সবাইয়ের সঙ্গে হই-হই করে। বাড়ি ফিরলেই আবার পড়া। পড়া। হোমটাস্ক। কোচিং।

তিতলি, কাহিনী, টুলকি, স্বপ্ন, পূষণ, আকাশ—সকলেরই বেশ মন খারাপ।

মন খারাপ বড়দেরও।

দশমীর সন্ধ্যায় রেললাইন পেরিয়ে ওপারে অনেকখানি হেঁটে সবাইকে রাবণ পোড়ান দেখতে নিয়ে যাবে বলেছে শম্ভু। গোটা বলরামপুর জমা হবে ওই মাঠে। ভিড় আর ভিড়। সাইকেল। নানারকম খাবারের দোকান।

সন্ধে হতেই রাম সাজা একজন তির মেরে খড়ের রাবণের গায়ে আগুন ধরিয়ে দেবে। সঙ্গে-সঙ্গে নানারকম বাজির শব্দ। আকাশ লাল হয়ে উঠবে বাজি আর রাবণ পোড়ানোর আগুনে।

তারপর ফেরার সময় কি ভিড়, কি ভিড়। সবাই ঘরে ফিরছে। ছোটদের হাত বড়রা চেপে ধরে আছে ভালো করে। পাছে না ভিড়ের চাপে ছিটকে যায় কেউ।

সেদিন রাতেই শম্ভু সিং সর্দার দুটো বনজারা পুতুল এনে চুপি-চুপি তিতলি আর টুলকিকে দিয়ে গেল।

অনেকটা যেন লোমওয়ালা কুকুর। সারা গায়ে লোম। লোমওয়ালা মুখে কালো, কুতকুতে দুটো চোখ। পুতুল দুটো আবার পিক-পিক শব্দ করে।

পুতুল হাতে পেয়ে টুলকি আর তিতলি বলে উঠল, কি সুইট! কি সুইট! থ্যাঙ্ক ইউ শম্ভুদাদা।

## উরমার হাট, রাবণ পোড়া

সকালে উঠেই আকাশের মনে হল বলরামপুর থাকার দিন একটু একটু করে ফুরিয়ে যাচ্ছে। রোদ্দুরের রঙে মিশে আছে ছুটির আলো। সেই আলোর দিকে তাকালে আকাশের মন ভালো হয়ে যায়। আবার উত্তরপাড়ার বাড়িতে ফিরে গিয়ে পড়তে বসতে হবে ভাবলে তার মন খারাপ হয়ে যায়। পড়া পড়া পড়া। মা খালি পড়তে বসতে বলে। দিদি দিব্যি পড়ে। নিয়ম করে পড়তে বসে। পড়তে কি ভালো লাগে দিদির? রোজ রোজ একই পড়া! দিদিকে জিগ্যেস করলে ঘাড় নাড়বে। বলবে ভালো লাগে। কি করে ভালো লাগে এত এত পড়া? কোচিং? গানের ক্লাস!

এবাড়ির উঠোনে পেয়ারাগাছের ডালে বাঁধা দড়িতে পিঁড়ি ঝুলিয়ে যে দোলনা, তাতে হেমা দুলছে। হেমা দুলতে-দুলতে হাসছে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে হেমার ভাই ভিকি। ঘরে বসে-বসেই, উঠোনে না নেমে এসব দেখতে পাচ্ছে আকাশ। এরকম অনেক কিছু চোখে ভাসে আকাশের। এই যে মানা—ঠাকুমা গল্প করে, আকাশের বাবার ঠাকুর্দা—সুখেন্দুবিকাশ গাঙ্গুলি বাড়িতে ময়ূর পুষেছিলেন আর ভাল্লুক। সেই ময়ূর সারাদিন ছাড়া থাকত, এই বাড়িতে। এদিক-ওদিক ঘুরত। কখনও-কখনও চলে যেত একটু দূরে। কিন্তু দুপুরবেলা সেই ময়ূর রোজ চলে আসত নিয়ম করে। বাবার ঠাকুমা রোজ দুপুরে তাকে দু ছিপি করে সর্ষের তেল খেতে দিতেন। সর্ষের তেলের লোভেই কি আসত ময়ূর? কে জানে! আমার ঠাকুমা, যাকে আমি আর দিদি 'মানা' বলে ডাকি, সেই মানা কিছুতেই বলতে পারে না সর্ষের তেল খেয়ে ময়ূরের নেশা হয় কি না!

তুই কিরে মানা! কিছুই জানিস না। এটুকু বলে আকাশ ঠাকুমার মুখের

দিকে তাকাল। এরকম কথা শুনলে মানা অবশ্য রাগ করে না। বরং মুখ টিপে টিপে হাসে। বাবার ঠাকুমা—মানার শাশুড়ি ছিলেন ছোট্টখাট্ট মানুষ। খুব সুন্দর। আর ফরসা। গায়ে অনেক গয়না। এসব বলতে-বলতে হঠাৎই মানা চুপ করে যায়।

কিরে মানা, চুপ করলি কেন? আকাশ তাড়া দেয়।

মানা তখন হয়তো অন্য কোনও গল্পের কথা ভাবছে। সেই অদ্ভুত মানুষটি, যাঁর গাড়ির বনেট খুলে গেলে রাস্তা থেকে একটা সাঁওতাল ছেলে ধরে নিয়ে যিনি বনেটের ওপর বসিয়ে দিতেন। কিংবা দামদায়—পুরুলিয়া থেকে গাড়িতে বলরামপুর আসার সময়, দাদাকে—মানে আকাশের বাবা গৈরিক গাঙ্গুলির বাবা অমল গাঙ্গুলিকে ডাকাতরা টেঁকল। টেঁকল মানে ঘিরে ফেলা, এই পুরুল্যার ভাষায়। যেমন ডিংলা মানে কুমড়ো, ডাং মানে লাঠি, বনি মানে শালিক পাখি, বাঁধ মানে পুকুর। বাবা এইসব কথা ভালো জানে। বলতেও পারে। তা দাদা—মানে আকাশের ঠাকুর্দা অমল গাঙ্গুলিকে দামদায় টেঁকল ডাকাতরা। পুরুলিয়া থেকে গাড়ি চালিয়ে আসছিলেন অমলবাবু। সঙ্গে আকাশের বাবা, কাকারা আছে। আছে রাইফেল। তার ভেতর গুলি ভরা। পুরুলিয়া থেকে টামনা। টামনা থেকে কাঁটাডি। তারপর ছোট উরমা, উরমা। শেষে বলরামপুর। দামদা তো এরই মাঝখানে। কাঁসাই নদীর ওপর ব্রিজ। নিচে কাঁসাই বা কংসাবতী। কালচে পাথর, হলুদ বালি —তা ছুঁয়ে ছুয়ে কাঁসাইয়ের জল কোথায়—আরও কত দূরে যেন চলে যাচ্ছে। সেই জলে নীল আকাশ, তখন তার গায়ে কালো কালো ফুটকি হয়ে ভেসে বেড়ান উড়ো পাখিদের ছায়া। সব মিলিয়ে সে এক আশ্চর্য ছবি। দিনের বেলা মাঝে মাঝেই তা ভেসে ওঠে কাঁসাইয়ের জলে।

রাতে সেই কাঁসাই-ই একেবারে অন্যরকম। একদম কালো কুষ্টিজল। পাথর, নদীর জল বালি—সবারই একরকম রঙ, সবই কালো। তখন আলো আসে নি। মানে ইলেকট্রিক নেই। বলতে বলতে মানা যেন সেই সময়টা পরিষ্কার দেখতে পায় চোখের সামনে। আর মানার সঙ্গে সঙ্গে আকাশও। কাঁসাই ব্রিজের ওপর বড়-বড় বোলডার আর কাটা গাছ ফেলে অমল গাঙ্গুলি মশাইয়ের গাড়ি আটকাল ডাকাতরা। টেঁকল। পুরুলিয়া-বলরামপুরের হিসেবে তখন বেশ রাত। শীতের দিন। রাত বড়। সন্ধে একটু তাড়াতাড়িই

নামে। সামনে বোল্ডার আর গাছ ফেলা আছে দেখে তো দাদা গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়ল। হাতে রাইফেল।

বলতে-বলতে মানা একটু চুপ করল। আকাশ জানে এরপর কি হবে। এর আগেও এই গল্প বহুবার শুনেছে আকাশ। তিতলি। তবুও মানা এত সুন্দর বলে যে চুপ করে বসে থাকতে হয়, এরপর কি হয় এরপর কি হয় —এমন একটা ভাব নিয়ে।

তোর দাদা নামার পর যারা বোলডার ফেলে দূরে দূরে দাঁড়িয়েছিল, তারা সবাই এগিয়ে এসে এক দম জিভ কেটে ফেলল লজ্জায়।

সুখেনবাবুর ব্যাটা বটে ইটি। গুণ্ডাবাবু। আমাদের গুণ্ডাবাবু গো। বলতে বলতে তারা একেবারে নুয়ে পড়ল। তোর দাদা তো ততক্ষণে যা বোঝার বুঝে নিয়েছে। এদের এত লজ্জা, ক্ষমা চাওয়াচাওয়ি কেন। সেটাও বুঝতে পেরে গেছে। হাতের রাইফেলটা ভালো করে বাগিয়ে তোর দাদা বোলডারগুলো সরিয়ে ফেলতে বলল। ওরা আর কোনও কথা না বলে সরিয়ে ফেলল সব বোলডার।

আকাশ পরিষ্কার দেখতে পেল তার ঠাকুর্দা—যাকে কি না সে আর দিদি দাদা বলে, সেই দাদুর মাথা ভর্তি ব্যাক ব্রাশ করা কালো চুল। খাকি ফুল প্যান্টের ভেতর শাদা শার্ট গুঁজে পরা। পায়ে ফিতে বাঁধা কালো শু্য। মানুষটা খুব ভালো। সবাই তাকে খুব ভালোবাসে।

তারপর কি হল? কি হল? জানতে চাইল ক্লাস টু-র পূষণ।

আকাশ টেরও পায় নি, টের পায় নি আকাশের ঠাকুমাও কখন যেন পূষণ, স্বপ্নদাদা, কাহিনীদিদি একটু একটু করে ঘিরে বসেছে মানাকে।

কথা বলতে গেলে চোখ পিট পিট করে পূষণের। দু চোখের ওপর হাতে করে ঠেলে চশমা ঠিক করে বসিয়ে পূষণ বলল, কি, কি হল তারপর?

তারপর আর কি হবে? মানার গলায় এখন আর কোনও ওঠা-নামা নেই।

আকাশ জানতে চাইল, কিরে মানা বলবি তো, কি হল তারপর?

সবই তো তোমার জানা।

তা হোক, তুই বল।

বলেছি তো তোদের দাদাকে দেখে সেই যে যারা কাঁসাই নদীর ওপর

বোলডার ফেলে আটকেছিল, তারা রীতিমতো লজ্জা পেল। বুঝতে পারল কাকে তারা আটকেছে ডাকাতির জন্যে।

কেন, দাদাকে দেখে লজ্জা পেল কেন ডাকাতরা?

মানাকে এই কথা জিগ্যেস করেই আকাশ বাইরের আকাশের দিকে তাকাল। সেখানে এখন কত রকম রঙ। ইস, এতগুলো রঙ যদি একসঙ্গে জোগাড় করে পর পর সাজিয়ে ছবি এঁকে ফেলা যেত। কি কাণ্ডটাই হত তা-লে। কি রঙ কি রঙ—বাপরে বাপ। ভাবতে-ভাবতে আকাশ পূষণের দিকে তাকাল। পূষণও আকাশের দিকে। আকাশের চোখে চোখ পড়তেই হেসে ফেলল পূষণ। সঙ্গে আকাশও।

আসলে তোমার দাদা—তাকে তো সবাই চিনত। খুব ভালো করে চেনে সকলে। তোমার দাদার বাবা—তাকেও তো সব্বাই চেনে। তার ওপর হাতে রাইফেল। ওরা নিজেরাই হাতে হাতে বোলডার সরিয়ে দিল।

তারপর? তারপর আর কি! তোমার দাদার গাড়ি গড় গড় গড় গড় করে চলে এল বলরামপুর। মানার কাছে বার বার শোনা গল্পটা কিছুতেই পুরনো হয় না আকাশের কাছে। কিংবা বাবা যখন বলে দাদার কথা। খাকি ফুলপ্যান্টের ভেতর শাদা ফুল শার্ট বা হাফ শার্ট গুঁজে পরা একজন মানুষ। মাথা ভর্তি চুল। দু চোখে অনেক স্বপ্ন। সেই মানুষটি ভালো ছবি তুলতে পারেন। শিকার করতে পারেন। পারেন গাড়ি চালাতে। নিজের মতো করে ফার্নেস ঢালাই করে টেক্কা দেন সাহেবদের। বিলেত থেকে সাহেবরা আসেন তাঁকে দেখতে। আবার এখানে—বলরামপুরে দেশের বাড়ি এলে তিনি সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। গাছেরা তাঁর সঙ্গে কথা বলে। কথা বলে পাখিরা। মানুষটা খুবই ভালোবাসেন গাছপালা। পাখি। কুকুর। এসব যত্ন করে পোষেন। নিজের হাতে গাছের গোড়া খুঁড়ে দেন। জল, সার—সব পরপর। নিয়ম করে। খাঁচার পাখিদের খেতে দেন। কুকুরকেও।

এসব কথা আকাশ শুনেছে বাবার কাছে, মায়ের মুখে। মানার বলা গল্পে। আকাশ সেই সব কথা জুড়ে জুড়ে তার দাদার একটা ছবি তৈরি করে। সেই গল্প, ছবি কখনও ফুরোয় না। চলতেই থাকে। চলতেই থাকে। চলেই। বলরামপুরে—দেশের বাড়িতে এলে সেই সব গল্প আরও যেন জমিয়ে জাঁকিয়ে বসে। আকাশ শোনে। তিতলি শোনে। বাবা বলে। মা বলে।

মানা বলে। শম্ভুদাদা বলে। বলে সোনাদাদা। সোনাদাদা শম্ভুদাদার বন্ধু। সোনা কালিন্দি। শম্ভু সিং সর্দার আর সোনা কালিন্দি—আমরা এলেই সবসময়ের জন্যে এখানে—এই বাড়িতে।

বাইরে ঝলমলে রোদ। আকাশদের বলরামপুরের এই বাড়িতে পেয়ারার ডালে দড়ি বাঁধা দোলনায় সেই রোদ্দুরের টুকরো। রোদের ঝাপটা দড়ির গায়েও। দূরে ইঁদারার গায়ে, জলে সেই আকাশ-আলোরই ছড়াছড়ি। ইঁদারার পাড়ে কলমি শাকের সবুজ সবুজ ঝোপে, তার নীলচে ফুলে, কুমড়োলতার সবুজ সবুজ কচি ডগে পাতায়, আখ গাছের পাতায় পাতায় রোদ আর রোদ। আকাশ জানে দূরে বড়কানা, ছোটকানা, বুড়াবুড়ির গায়েও এই আলো। বাবা-কাকাদের ওয়াকারস টেবিলেও সেই রোদ-বাহার। গুঁড়ো-গুঁড়ো রোদ পড়েছে সেই সবুজ মাখা নীলে।

হই হই করতে করতে সবাই একসঙ্গে উঠোনে, রোদের ভেতর যেতে চাইল। পূষণ সকলের আগে। তারপর স্বপ্নদাদা, কাহিনীদিদি, দিদি। টুলকিদিদি একটু দূরে চুপচাপ বসে। আকাশের ঠিক এখনই এমন হুড়যুদ্ধ ভালো লাগছে না। ওরা সবাই এখন দোলনার আশপাশে যাবে। নয়ত ছাদে উঠবে।

ছাদে উঠলে অনেকটা আকাশ দেখা যায়। বুড়াবুড়ি, ছোটকানা বড়কানা, রেল লাইন। লাইনের ওপর দিয়ে চলে যাওয়া ট্রেন। গোটা ছবিটা পরপর ভেসে উঠে সামনে আসে আকাশের। পাশেই বরাভূম স্টেশন। লাইনের ধারে ধারে বনজারাদের তাঁবু। ওরা সারা বছরই ওখানে দল বেঁধে থাকে। বাবা তো সেরকমই বলেছে আকাশকে।

বনজারাদের তাঁবু থেকেই শম্ভুদাদা বনজারা পুতুল এনে দিয়েছে দিদি আর টুলকিদিদিদের। আকাশই জানে শুধু। আর কেউ জানে না।

রাত হলে রেল লাইনের ধারে বনজারাদের তাঁবুর গায়ে লালচে আগুন জ্বলে। সেই আগুনের মাথায় কালো কালো ধোঁয়া। শম্ভুদাদা, সোনাদাদা বলে, ওখানে শেয়াল পুড়িয়ে খায় বনজারারা। শেয়াল মারে। তারপর পোড়ায়। সেই শেয়াল পোড়ান গন্ধ একটু একটু করে হাওয়ায় মেশে। বিচ্ছিরি পোড়া একটা দুর্গন্ধ চারপাশে ঘোরে। সেই গন্ধ নাকে গেলে গা গুলোয়। খালি থুতু উঠে আসে মুখের ভেতর। ঘেন্না লাগে। কি করে খায় ওরা শেয়াল পোড়া? সত্যি সত্যি খায় কি? শম্ভুদাদা তো তাই বলে। সত্যি কিনা কে জানে!
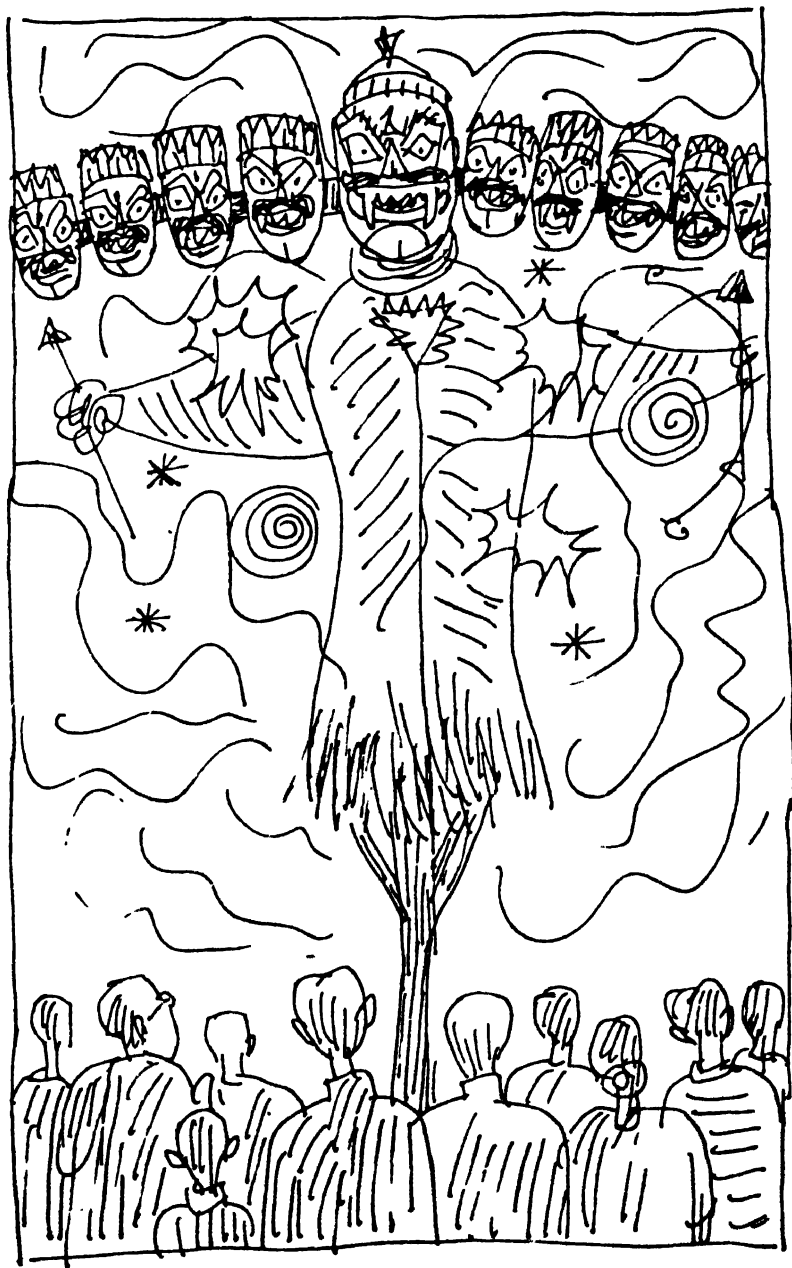
এর মধ্যেই বাবা, দেবুজ্যেঠু, দীপংকরজ্যেঠু, ঋতুজ্যেঠুরা বাজার নিয়ে ফিরল। আকাশ জানে বাজার এসে গেল, তার মানেই জিলিপি আছে। আছে খাড়ি-নিমকি। আরও হয়ত কিছু আছে।

ঠিক তখনই উঠোনে পেয়ারা গাছের ডালে দড়ি বাঁধা দোলনা দুলিয়ে দিল স্বপ্নদাদা। আবারও দোলাল। এবার বেশ জোরে। দোলনায় বসা হেমা হেসে উঠল। খুব সুন্দর লাগে হেমাকে এমন হাসলে। দোলনার পাশে দাঁড়িয়ে হেমার ভাই ভিকি। হেমার দোলনা চড়া শেষ হলেই ভিকি উঠবে। আনন্দ করবে দোলনায় বসে বসে। কাল হেমার দোলনা চড়া এমন একটা ছবি নিয়েছিল দেবুজ্যেঠু। এ সব ভাবতে ভাবতে আকাশ বাইরে এল।

শীলাপিসি ততক্ষণে স্টোভ জ্বেলে গরম জল চাপিয়েছে। শোঁ-শোঁ শব্দ উঠছে স্টোভের।

দুপুর দুপুর উরমার হাটে যাওয়া হবে—এমনটি বাবা বলা মাত্র পূষণ, আকাশ, টুলকি, তিতলি, স্বপ্ন, কাহিনীরা হই-হই করে উঠল একসঙ্গে। বলরামপুর হাট তো দেখা হয়ে গেছে। এবার উরমার হাট। শুক্রবার শুক্রবার হাট বসে উরমায়। মঙ্গলবার-মঙ্গলবার বলরামপুরের হাট।

দুপুরের খাওয়া সকাল-সকাল সেরে নিতে হল। তার আগে তাড়াতাড়ি চান করে নেওয়া ইঁদারার জলে। বাবা বলল, উরমার হাট হয়ে আমরা রাবণ পোড়া দেখতে যাব।

ওহ হো, রাবণপোড়া! পূষণ কিছুতেই বুঝতে পারল না ব্যাপারটা আসলে কি। রামায়ণ টি ভি-তে দেখেছে পূষণ। রামায়ণের গল্প শুনেছে খড়দার বাড়ির দাদুর কাছে। রাভানা—দ্য ইভল ডেমন। চশমার আড়ালে দু চোখ সামান্য পিট পিট করে পূষণ বলল, সত্যিকারের রাবণ! সত্যিকারের?

শীলাপিসি সব্বাইকে তাড়া দিয়ে সাত তাড়াতাড়ি গরম গরম ভাত খাইয়ে দিল। সঙ্গে আলুভাতে. ডাল। অনেকটা করে ভাত খেয়ে রিকশায় রিকশায় সবাই উরমার হাটে।

বলরামপুর থেকে উরমার হাটে যেতে কালিমেলা পড়ে। বলরামপুরের যাঁরা পুরনো লোক, তাঁরা বলেন, কালিমেলা। এখন কেউ-কেউ কালিতলাও বলছে। বাবা অবশ্য কালিমেলাই বলে। এরকম দুর্গামেলাও আছে। সেটা বলরামপুর বাজার যেতে বাঁ দিকে গলির ভেতর পড়ে কালিমেলা।

উরমা যাওয়ার রাস্তায় বাঁ দিকে পড়ে। আবার উরমা থেকে বলরামপুর ফেরার সময় ডান দিকে পড়বে। পিচের রাস্তা তেমন চওড়া নয়। তার ওপর নতুন নতুন বাম্প। বেশ উঁচু উঁচু। চলতে গেলে বেশ জোরে ঝাঁকানি লাগে। আকাশ জানে তার বাবা মা দুজনেরই কোমরে ব্যথা। বাবা তাকে ছোটবেলায় ভালো করে কোলেও নিতে পারে নি কোমরে অসুবিধের জন্যে। বাবাকে এখনও ডাক্তারি বেল্ট পরতে হয় বাইরে বেরনর আগে। আজও উরমার হাটে যাওয়ার আগে বাবা চওড়া বেল্ট বেঁধে নিল কোমরে।

পিচ রাস্তার পাশেই হাট। রিকশা থেকে নেমেই ওরা ছড়িয়ে পড়ল হাটে।

উরমার হাটের মাথার ওপর সূর্য একটা অনেক অনেক পাওয়ারের বালব হয়ে জ্বলছে। এই হাট বলরামপুরের মতো বড় নয়। কিন্তু তারও একটা আলাদা সৌন্দর্য আছে—দেখতে-দেখতে মনে হল দীপংকরের। ঋতুপর্ণ, দেবু, পার্থ, গৈরিকরা নিজের-নিজের মতো এদিক ওদিক তাকাচ্ছে।

উরমা-হাটে চাল নিয়ে বসেছে অনেকে। মশলাপাতি। হলুদ, রসুন, শুকনো লঙ্কা। কাঠের বোঝা মাথায় নিয়ে দূর-দূর থেকে এসেছে মেয়েরা। তারা সোজা করে দাঁড় করিয়ে রেখেছে সেই সব কাঠ।

রাস্তা থেকে নেমে হাটের ভেতর ঢুকে পড়তে গেলে ডান দিকে চালাঘর। সেখানে চায়ের দোকান। অনেকগুলো সাইকেল দাঁড় করান সেখানে। সামনা সামনি তাকালে আবছা মতো পাহাড়ের সারি। সেখানে দুপুরের রোদ পড়ে আছে। অনেকটা যেন হাতির পিঠ—এমন মনে হয় পাহাড়দের।

আকাশের মনে হল এই সব পাহাড়দের কেউ বুঝি নিজের রঙ-পেনসিলে এঁকে রেখেছে আকাশেরই গায়ে।

হাটে সুন্দর-সুন্দর কাপড় চাদর নিয়ে এসেছেন একজন।

পূষণ শুনতে পেল তার বাবা দর করছে সেই সব কাপড়, চাদর।

কোথা থেকে এনেছেন এই সব ধুতি, শাড়ি, চাদর? জানতে চাইল পার্থ।

ওড়িশা থেকে। নির্লিপ্ত, মুখে জবাব দিল লোকটি। মোটার দিকে

গড়ন। রঙ কালো। মাথায় মস্ত টাক। নাকের নিচে পুরুষ্টু গোঁফ। একটু চওড়া মতো জুলপি নেমে এসেছে কানের পাশ দিয়ে।

ধুতি-চাদর বিক্রি করা লোকটির মুখে পান। মুখ বললে হয়ত ভুল হবে। গালে। তাই গাল ঢিবলি মতো উঁচু হয়ে আছে।

পানের পিক জড়ান গলায় কথা বলছিলেন সেই লোকটি।

আকাশ শুনল বাবা জানতে চাইছে ধুতির দাম কত?

একশো তিরিশ টাকা।

আর শাড়ি?

দুশো দশ টাকা।

শাড়ি কি এগার হাত?

না দশ হাত। ধুতি পাঁচ হাত।

গামছা কত করে দিচ্ছেন? জানতে চাইল দেবুজ্যেঠু।

পঁয়তাল্লিশ টাকা?

এ সবই কি ওড়িশার? পার্থকাকু সামনে এগিয়ে এসে জিগ্যেস করল।

হ্যাঁ, ওড়িশার।

ওড়িশার কোথাকার, সম্বলপুরের, না কটকি? এবারের জিজ্ঞাসা দেবুজ্যেঠুর।

ওড়িশার। সেই গালে পান টোপলা করা লোকটি দিব্যি বলে উঠল।

ওড়িশার মানে! ওড়িশার কোন অঞ্চলের?

ওড়িশার। আবার একই জবাব পাওয়া গেল। আকাশ শুনল, পূষণ শুনল। শুনল স্বপ্ন, কাহিনী, টুলকি, তিতলিরা।

ও ওড়িশার! পার্থ বলল।

ও তাই তো. ওড়িশার। বলে উঠল দেবু।

হ্যাঁ, ওড়িশারই। বলল গৈরিক।

আর এসব বলতে-বলতে ওদের সকলের এক সঙ্গে মুখটিপে হাসি।

ঘড়ির কাঁটা কখন যেন বারোটা, একটা. দেড়টার ঘর ছাড়িয়ে দুটোর দিকে রওনা দিয়েছে। কোথা দিয়ে সময় যে চুরি হয়ে যায়, কিছুতেই টের পাওয়া যায় না!

বলরামপুর এলে ঘড়ির দিকে বিশেষ তাকাতেও ইচ্ছে করে না।

গৈরিক তাই হাতঘড়ির দিকে না তাকিয়ে দূরের পাহাড়ের দিকে তাকাল। হাটের গায়ে পুকুর। বেশ খানিকটা নিচে। সেখানে ভেসে আছে গোটা আকাশের ছায়া।

সেদিকে তাকিয়ে গৈরিকের তার ছোটবেলার কথা মনে পড়ে গেল। বাবার হাত ধরে ছোটভাই বুবুকে সঙ্গে নিয়ে বলরামপুরের এখানে ওখানে সেখানে। কিংবা বলরামপুরের আশপাশে। শীতকালে প্রায় রোজই পিকনিক। নতুন নতুন পাহাড় জঙ্গল মাঠ আবিষ্কার করা। গাছ চেনা, পাখি চেনা। পাথর কুড়নো, অভ্রের টুকরো কুড়িয়ে শীতের দিন হলে হাঁটু ঝুল অলেস্টারের পাশ পকেটে রাখা। সূর্য-শিশির, নানারকম ক্যাকটাস, সব চেনা। বাবা তখন রোজই রবিনসন ক্রুশো। রোজ রোজ নতুন কিছু খুঁজে বের করা। নতুন পৃথিবী। ভাবতে-ভাবতে চোখে জল এসে গেল গৈরিকের। বাবার কথা এমনিই মনে পড়ে সব সময়। তার ওপর বলরামপুরে এলে আরও বেশি বেশি করে মনে আসে। মনে হয় এই বুঝি দেখা হয়ে যাবে বাবার সঙ্গে।

পার্থ, দেবুরা ঝুঁকে পড়ে ওড়িশা থেকে আনা ধুতি শাড়ি গামছা দেখছে। শাদা জমির ওপর লালে শাদা-কালোয় কি সুন্দর সুন্দর নকশা। পেখম তোলা ময়ূর, পেখম গোটান ময়ূর। ফুল, পাতা, লতা। সবটা এমন মানানসই যে দেখে মন ভালো হয়ে যায়। একটু বেশি ডিজাইনঅলা শাড়ির দাম আড়াইশো। আবার নতুন করে দর করে জানতে পারল পার্থ।

দুপুরের রোদ পড়েছে ধুতি-শাড়ির জমিতে। ডিজাইনে। অবাক হয়ে সেদিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল গৈরিক। দেবু।

পূষণের মনে হল দেবুজ্যেঠু এখন কি মনে মনে নতুন কোনও ছবি আঁকার কথা ভাবছে! নাকি অন্য কিছু!

তিতলির মনে পড়ল দেবুজ্যেঠুতো সুন্দর গল্প বলতে পারে সবাইকে নিয়ে বসে। ঘিরে আছি আমরা সবাই দেবুজ্যেঠুকে। আর দেবুজ্যেঠু বলে যাচ্ছে আমাদের। নানা গল্প। কথার ফাঁকে-ফাঁকে মাঝে-মাঝে জিগ্যেস করে, তোরা কাটলেট পেয়েছিস কখনও পরীক্ষায়?

টুলকি, তিতলি, স্বপ্নরা প্রথমে অতটা বুঝে উঠতে পারে নি কাটলেট আসলে কি!

পরীক্ষায় কাটলেট পাওয়া মানে রেজাল্ট খারাপ হওয়া। পরীক্ষার খাতায় নম্বর কম পাওয়া। এ কথাটা নতুন শেখা হল।

দূরে পাহাড়ের মাথায় আকাশকে আরও খানিকটা রঙিন করে দিয়ে সূর্য একটু একটু করে হেলে যাচ্ছে। বেশ গরমও লাগছে এখন। ঘাম দিচ্ছে। ক্যামেরা চোখে নিয়ে তিতলির হঠাৎ মনে পড়ল এই ছবিটা যদি তুলে রাখা যায়। যেমন ভাবা তেমন কাজ। শাটার টিপল তিতলি।

এই হাটে খুব মোরগ লড়াই হয়। বিজয়া দশমীর দিন বা পরে যে শুক্রবার পড়ে, সে দিন থেকেই মোরগ লড়াই শুরু। আজ তো শুক্রবার। আবার বিজয়া দশমী। প্রতি হাটবারে এখন মোরগের লড়াই হবে। চলবে দোল পূর্ণিমা পর্যন্ত।

উরমার হাটে এদিকে ওদিকে পায়ে দড়িবাঁধা মোরগ। তারা চিৎকার করে উঠছে মাঝে মাঝে কঁকর কোঁ—কঁকর কোঁ—কোঁ—

সেই সব ঝুঁটি ফোলান, ঝুঁটি ছাঁটা মোরগদের ধরে ধরে বসে আছে লোকজন। কোনও-কোনও মোরগকে বেঁধে রাখা হয়েছে খুঁটোর সঙ্গে।

খুঁটোয় বাঁধা দড়ি পা ঝাড়া দিয়ে দিয়ে খুলতে চায় মোরগ। পারে না। সেদিকে তাকাতে তাকাতে পূষণ হঠাৎই চোখ পিট পিট করে বলে ওঠে, ওয়াইলড কক। তাই না?

দীপংকর ঘাড় নেড়ে বলল, হ্যাঁ। ওয়াইলড কক।

তুই নিবি? জানতে চাইল দীপংকর।

ফোগলা মাড়ি বের করে চোখ পিটপিট করতে-করতে বলে উঠল পূষণ, না।

সূর্য একটু একটু করে কাত হয়ে যাচ্ছে মাথার ওপর ছড়িয়ে থাকা আকাশের গায়ে। সেদিকে তাকিয়ে হঠাৎই বলে উঠল গৈরিক, এবার চল সব। পৌঁছতে হবে রাবণ পোড়ার মাঠে।

এখান থেকে রিকশায়-রিকশায় বাড়ি। তারপর আবার সেখান থেকে রাবণ পোড়া দেখতে যাওয়া।

গৈরিকের কথা শুনে শম্ভু সিং সর্দার বলল, কাকা, এখনই যেতে হবেক। নইলে দের হয়ে যাবে। সাড়ে চারটায় রাবণ পুড়্যা।

শম্ভুর কথা শুনে তিতলি আর না হেসে পারল না। বলল, তুই সব জানিস শম্ভুদাদা! তাই না!

জানিসই তো। তোরা যদি না যাবিস তো লণ্ডটতে পারবিস না।

কি তুই খালি যাবিস, পারবিস, খাবিস—এসব বলিস শম্ভুদাদা!

বুইন, তু কথাটা শোন আগে। নাইতো সোনাকে পুছ!

আকাশের হাতে গৈরিকের ডাং। আকাশ বলল, চল-চল শম্ভুদাদা। রাবণ পোড়া দেখতে হবে।

চল ভাই। জলদি জলদি না যাবিস তো—বলেই কি ভেবে যেন শম্ভু চুপ করে গেল।

আবার যাবিস! তুই ঠিক করে কথা বল তো শম্ভুদাদা। এটুকু বলার সঙ্গে সঙ্গে চোখ পাকাল তিতলি।

শম্ভু ওর মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেল।

বাড়ি এসে গৈরিক উঠোনে দড়ির খাটিয়ার ওপর বসল।

উঠোনে পেঁপেগাছ, কুমড়োলতার মাথায় রোদ্দুর। গরম কিছুতেই কমছে না। সারা গায়ে কেমন যেন একটা চিটপিটোনি ভাব। গা চুলকোয়। ঘামে ভিজে যায় গেঞ্জি। এখন যেতে হবে রাবণ পোড়া দেখতে।

গৈরিকদের বাড়ি থেকে রাবণ পোড়ার মাঠ বেশ দূর। গৈরিকই তাড়া দিয়ে সকলকে রেডি করে নিল।

তারপর তো দল বেঁধে হাঁটা। বরাভূম স্টেশনের পাশ দিয়ে রেল লাইন পেরিয়ে কাঁটাডির দিকে যাওয়ার রাস্তা ধরে ধরে হেঁটে রাবণ পোড়ার মাঠে। সেই রাঙাডির শালবন আর নেই। কেটে কেটে তার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে যেন কারা। নতুন নতুন যে সব গাছ লাগান হয়েছে সবই প্রায় ইউক্যালিপটাস, আকাশমণি। এসব গাছ—এই ইউক্যালিপটাস, আকাশমণি দেখলেই রাগ হয় গৈরিকের। বন সৃজনের নামে এ কি ছেলেখেলা! কেন আমার দেশে কোনও গাছ নেই? সেই দিশি গাছ দিয়ে বন তৈরি করা যায় না? পুরুলিয়া এমনিতেই খরা প্রবণ। তার ওপর ইউক্যালিপটাস, আকাশমণি এত জল টেনে নেয়, যে জলের স্তর ক্রমশ নিচের দিকে। কেন অর্জুন লাগান যায় না? শাল, সেগুন? নিদেপক্ষে কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, সুবাবুল! কৃষ্ণচূড়া-রাধাচূড়া তো বলতে গেলে এখন দিশি গাছই হয়ে গেছে। তা নয়, খানিকটা ইউক্যালিপটাস আর আকাশমণি—সবুজায়ন-বনায়নের নামে।

রাঙাডির বনের কথা—শালের জঙ্গল, সবুজ, কচি শালপাতার গন্ধ

মনে পড়লে ফিরে আসে গৈরিকের ছোটবেলা। রাঙাডির বনে তখন শেয়াল, খ্যাঁকশিয়াল, ভাম, বেজী। কখনও-কখনও নেকড়ে। সাপ। বনবরাও থাকত কি! থাকত বোধহয়।

সেই রাঙাডির বন এখন আর নেই। এখন কেন, বেশ কয়েক বছরই হল নেই। কোথায় গেল সেই উধাও সবুজ? বনের গন্ধ! ভাবতে-ভাবতে বড় করে শ্বাস পড়ল গৈরিকের।

রোদ্দুর নিজের মতো গড়িয়ে নামছে ইঁদারার গায়ে। জলে। গভীরের সেই কালো জল চুপ করে আছে। তার বুকের ওপর তখন অনেক জল-মাকড়সা। গৈরিক ইঁদারার ভেতর না তাকিয়েও খাটিয়ায় বসে বসেই দেখতে পেল অনেকগুলো জল-মাকড়সা কুয়োর জলের ভেতর সাঁতার কাটছে।

এই ইঁদারা ডিনামাইটে আগুন দিয়ে পাথর ফাটিয়ে তৈরি। গৈরিক শুনেছে তার বাবার কাছে। বলরামপুরের অনেক ইঁদারাই এমন ডিনামাইট দিয়ে ব্লাস্ট করিয়ে তৈরি। অনেক অনেক গভীর করার জন্যে এই ব্যবস্থা। জল ভালো হবে।

এই তো ছুটি ফুরিয়ে গেল। আজ দশমী। রাবণ পোড়া। দুর্গা ভাসান। তারপরই তো ফিরে যেতে হবে উত্তরপাড়ায়। দেবুদা, দীপংকরদা, ঋতুদা, পার্থরাও ফিরে যাবে নিজের নিজের জায়গায়। গিয়েই সেই কাজের আখমাড়াই- কলে পড়া। এতটুকু বিশ্রাম নেই। অবসর নেই। কাজ-কাজ আর কাজ। নাঃ, আর ভালো লাগে না। মাঝে-মাঝে মনে হয় সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে এসে বলরামপুরের বাড়িতে এসে থাকি। ছেলেমেয়ে দুটোকে কাছের কোনও স্কুলে ভর্তি করে দেব। আকাশ-তিতলিরা নিজের মতো বেড়ে উঠবে। সবুজের মধ্যে। রোদের ভেতর। হাওয়ার ভেতর। উধাও আকাশের নিচে।

দামদায় যাব। উরমা। ছোট উরমা। বলরামপুরের হাট। কাঁটাডি। টামনা। নিমডি। নিমডি থেকে আর একটু দূরে কানড্রা। এখন নিমডি কানড্রা—দুটোই ঝাড়খণ্ডে।

কিন্তু সেটাও বোধহয় হওয়ার নয়। এভাবে বলরামপুরে থাকার কথাটা হয়ত বা শুধুই স্বপ্নে থেকে যাবে। ভাবতে-ভাবতে আবারও লম্বা শ্বাসে বুক ভাঙল গৈরিকের। তারপরই তার মনে হল ঠাকুর্দা—সুখেন্দুবিকাশ গাঙ্গুলি পারতেন, বাবা অমল গাঙ্গুলি, মা গীতা গাঙ্গুলি

পারতেন, মাসের পর মাস বলরামপুরে থেকে যেতে। আমিই বা পারব না কেন?

পারব কি! পারলে বেশ হত। নিজের মনেই নিজে নিজে যুক্তি-তর্ক সাজিয়ে কাটাকুটি খেলছে গৈরিক।

হঠাৎই তিতলির গলা শুনে একটু যেন চমকেই উঠল গৈরিক।

বাবা, বুদ্ধদাদারা আমাদের সঙ্গে রাবণ পোড়া দেখতে যাবে।

কে বুদ্ধ? নিজের ভেতর থেকে নিজেকে তুলে নিয়ে এসে জানতে চাইল গৈরিক।

বরেনকাকুর ছেলে।

ও বরেনের ছেলে! যাবে।

বুদ্ধদাদার দিদিরাও যাবে বাবা।

তারা আবার কারা?

কেন, সোনালীদিদি রূপালীদিদি।

অ! ওই সেই মেয়ে দুটো। সুন্দর কথা বলে। স্কুলে পড়ে আবার সরকারি কি একটা গ্রাম সেবার কাজও করে। সাইকেলে ঘোরে গ্রামে গ্রামে। সে দিন কথা হচ্ছিল না ওদের সঙ্গে।

হচ্ছিল তো। বলে তিতলি বাঁ গালের পাশে টোল ফেলে হাসল।

তা হলে এবার যাওয়া যাক। বলেই গৈরিক উঠে দাঁড়াল।

মাঝে মাঝে যে ভাবি শুধু মাঝে মাঝে কেন, প্রায় সময়ই মনে হয়, বলরামপুরে এসে থেকে যাব, তারপর উত্তরপাড়ায় গিয়ে আবার কাজে জড়িয়ে পড়ি। জড়ান মানে শুধু জড়ানই নয়, বাঁধা পড়ে যাওয়া যাকে বলে। তখন কোথায় থাকে বলরামপুরের বাড়ি, এই উধাও আকাশ, প্রচুর আলো-হাওয়া, ইঁদারা, বরাভূম স্টেশন, শম্ভু সিং সর্দার, সোনা কালিন্দি, ডলির মা, হেমা, ভিকিরা।

কোথায় পড়ে থাকে রামচন্দ্র মাঝি—আমাদের রামদা। গেঁড়ুয়াতে যার নিজের বাড়ি। অযোধ্যা পাহাড় যাওয়ার রাস্তায় গেঁড়ুয়ায় এখনও ভালুক নামে। সেখানে আকাশ আরও নীল। রোদ অনেক বেশি সোনালি। জ্যোৎস্নায় অনেকটা বেশি রুপো মেশান।

সেই রামদা—আমাদের বাড়ি ছোটবেলা থেকে আসে। এখন বন

বিভাগের কর্মী। ভালো মাইনে পায়। বোনাস। কত বার রামদা বলেছে গেঁড়ুয়া যেতে। রামদা—ওদের বাবার বোন, রামদার পিসি—খেনি পিসি। এই তো এবারই বলরামপুরের বাড়িতে এসে রামদা বলছিল, একটা পাখমারা বন্দুক আমায় ব্যওস্থা করে দাও। হয় কি!

বললাম, হয়। তুই কলকাতায় আয় রামদা। তোকে কিনিয়ে দেব।

খানিকক্ষণ চুপ করে রামদা বলল, পাখ মারার থিঁক্যে ভারি কিছু—

আমি বুঝলুম রামদা আসলে মানুষ মারার বন্দুক চাইছে।

গৈরিকের মনে পড়ল রামদা বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জানতে চাইছে পাখ মারার থিঁক্যে ভারি কিছু—

এক সম্মুন্দি ভাইলচে—

তার মানে কেউ রামদাকে নজর করছে। নজরে রাখছে। কিংবা হয়ত রাখছে না। রামদা তাকে ফেলে দিতে চায়। বন্দুক দিয়ে গুলি করবে। তার জন্যে বন্দুক কেনা দরকার। পাখ মারা বন্দুক থিক্যে ভারি কিছু।

বলতে বলতে রামচন্দ্র মাঝি উঠে দাঁড়ায়। তেমন লম্বা নয়। কিন্তু একটু যেন সামনে ঝুঁকে হাঁটে। মাথার চুল বেশ পাতলা হয়ে গেছে। পরনের ফুলপ্যান্টটি পায়ার কাছে দু ফোল্ড গোটান। গায়ের ফুল শার্ট হাত গুটিয়ে পরা। রামদা যখন সামনে সামান্য ঝুঁকে হাঁটে, তখন দেখে মনে হয় তেমন জোর নেই পায়ে। ওদের পরিবারে অনেকেরই পায়ে জোর না থাকা একটা অসুখ। সেই রামদাও বন্দুক কিনতে চায়। যে বা যারা তাকে নিয়মিত নজরদারি করছে, তাদের উড়িয়ে দেবে বলে।

ওষুধের দোকানে গিয়ে নিয়মিত ট্যাবলেট কেনে রামদা। কি যে ছাই-মাটির অসুখ কে জানে! ভালো করে ডাক্তার দেখাবে না। কিন্তু আন্দাজে শরীর খারাপ হয়েছে এই রকম ভেবে নিয়ে মেডিকেল শপ থেকে গাদা-গুচ্ছের ট্যাবলেট কিনবে। কোনও নিয়ম না মেনে খাবে। যাকে বলে ভুলভাল ওষুধ খাওয়া। কিন্তু সেই রামদাই যখন গল্প বলত, কুঁইচবরণ কইন্যা তার মেঘবরণ ক্যাশ, তখন সেটা শোনার মতো ছিল। সত্যি সত্যি রূপকথার জগত নেমে আসত ঘরের ভেতর। মে-এ-ঘ বলে কি টান—

নিজের কোমরের ব্যথা, বাইরে বেরতে হলে বেল্ট বাঁধা, বয়েস বেড়ে যাওয়া—এসব ভাবলে আবার এক পা এগিয়ে দু পা পেছিয়ে যেতে হয়

পাকাপাকিভাবে বলরামপুর এসে থাকার ব্যাপারে। তখন লম্বা লম্বা হাই ওঠে। খিদে পায়। মন খারাপ লাগে। ভাবতে ভাবতে আবারও বড় করে একটা হাই তুলল গৈরিক।

পূষণ এস তাড়া দিল গৈরিককে। —কি গো চল! যাবে না রাবণ পোড়া দেখতে?

গৈরিক বলল, যাব বাবা। সবাইকে রেডি হতে বল। অন্তত যারা যারা যাবে।

বরাভূম স্টেশনের পাশ দিয়ে রেল লাইন পেরিয়ে সোজা হেঁটে এলে রাঙাডি। সেখানে এখন ছোটখাট সবজি-বাজার বসে সকালের দিকে। এই দুর্গাপুজোর সময়, অক্টোবরের শেষে কুমড়ো, পালংশাক, ঢ্যাঁড়শ। একজন দুজনই বসে। তারপর আছে খুজান সিংয়ের মুদিখানা। মুদিখানার গায়ে কুমোরবাড়ি। সেখানে এখন দেওয়ালির প্রদীপ। দেওয়ালির পুতুল। দাঁড়ান পুতুলের মাথায় সাজান অনেকগুলো পিদিম। এই সব প্রদীপের ভেতর তেল-সলতে দিয়ে আগুন জ্বালালেই আলো আর আলো। সমস্ত রাত আলোয় আলো।

বলরামপুরের প্রায় সবাই হাঁটছে এখন রাবণ পোড়ার মাঠের দিকে। সেখানে সন্ধে হতে না হতেই রাবণ পোড়া হবে।

ডাং হাতে হাঁটতে-হাঁটতে গৈরিক দেখতে পেল তার ডান দিকে বেশ উঁচু-উঁচু ইটের পাঁজা পর পর অনেকগুলো। সেদিকে তাকিয়ে বেশ কয়েক বছর আগে দেখা 'ম্যাকেনাস গোল্ড' সিনেমাটার কথা মনে পড়ে গেল। গ্রেগরি পেক, ওমর শরিফ। হিরোয়িনের নাম মনে নেই। এই সব ইটের পাঁজাদের দেখতে দেখতে কেন যেন 'ম্যাকেনাস গোল্ড'-এর কথা আবারও মনে পড়ল গৈরিকের। দূরে দূরে ধু-ধু মাঠ। মাথার ওপর উধাও আকাশ। সেখানে কোনও মেঘ নেই। পাখি নেই। অনেকটা দূরে ছাপকা ছাপকা সবুজ—কয়েকটা মাত্র গাছ। সে দিকে তাকিয়ে গৈরিকেব মনে হল এখনই ঘোড়া দাবড়ে বেরিয়ে আসবে গ্রেগরি পেক, ফ্র্যাংক ও নিরো, বার্ট ল্যাংকাস্টার, অ্যানতনি কুইন বা এরকম কেউ। তাদের ছুটে যাওয়া ঘোড়ার পায়ে পায়ে খুব ধুলো উড়বে। যে কোনও সময় উঠে আসবে বন্দুক পিস্তল বা রাইফেলের নল। তারপর হাওয়া কেটে কেটে ছুটবে সিসের গরম গুলি।

ডান দিকে ইটের পাঁজা, ফাঁকা মাঠ। সামনা সামনি দুটো উঁচু উঁচু মাটির বেদী। সেখানে পাশাপাশি দুটি দুর্গা মূর্তি। ভাসানে এসেছে। একটি একচালির একদম সাবেক বাংলা ডিজাইনের। অন্যটিও এক চালির। কিন্তু তার গড়নে মানভূমের ধাঁচ স্পষ্ট। গণেশের হাতে তির-ধনুক। দুর্গা অসুর লক্ষ্মী সরস্বতী কার্তিক গণেশ—সবই পুরুল্যার ছৌ মুখোশের আদলে তৈরি। প্রতিমা ঘিরে ভিড়। ঢাক বাজছে।

এসব যা দেখছে পূষণ, সবই তার কাছে অবাক ব্যাপার মনে হচ্ছে। রীতিমতো অবাক করা ব্যাপার। আকাশেরও খুব ভালো লাগছে সব দেখে। আকাশ দেখল পার্থকাকু ছবি তুলছে। তার চোখ ক্যামেরায় ভিউ ফাইনডারে। ডান হাতের আঙুল শাটারে, দিদিও ছবি তুলছে। আকাশকে কি একটা বলে তিতালি শাটার টিপল।

একটু একটু করে ভিড় বাড়ছে। জমে উঠছে মেলা। খোসা সমেত বাদাম ভাজার গন্ধ আস্তে-আস্তে চারিয়ে যাচ্ছে চারপাশের হাওয়ায়। আঃ, এই গন্ধটা এখানে—এই বলরামপুরে এলে পাই। গৈরিকের মনে পড়ল। রিকশাভ্যানে পর পর আসছে চিনেবাদাম, পানিফল। পাশে চাটের গাড়ি। ফুচকা, ঘুগনি, চুরমুর।

ডান দিকে বেদীর ওপর জোড়া দুর্গা-প্রতিমা। সেখানে ডিডিম-ডিম-ডিডিম-ডিম শব্দে খুব আস্তে-আস্তে ঢাক বাজছে। বাঁ দিকে রিকশা ভ্যানে পর পর দোকান লেগে গেছে। একটা বড় পাকুড় গাছের পেছনে ফাঁকা মাঠে মোরগ-লড়াইয়ের তোড়জোড়।

উরমার হাটের মতোই এখানে মোরগদের ডাক ভেসে উঠছে—কঁকর-কোঁ। কঁকর-কোঁ।

কাল তোরা কাঁড়া খুঁটা দেখতে পেলি না বুইন। কাঁড়া কাটাও দেখলি না।

তুই আর বলিস না শম্ভুদাদা। এই দেখাবি সেই দেখাবি বলিস—দেখাস না। এখন বলছিস কাল কাঁড়া খুঁটা, কাঁড়া কাটা, এ সব হয়ে গেল, কই! কাল তো বলিস নি, কাল তো চাট খাওয়াতে নিয়ে গেলি। তখনই বলতে পারতিস। সে তো বললি না।

তিতলির ধমক শুনে শম্ভু সিং সর্দার চুপ করে গেল।

কি, কি—দেখাতে নিয়ে যাবে শম্ভুদাদা—? পূষণ জানতে চাইল।

কাঁড়া মানে বুঝিস? জানতে চাইল তিতলি।

না। ঘাড় নাড়ল পূষণ।

কাঁড়া মানে মোষ। এখানে—পুরুলিয়ায় মোষকে কাঁড়া বলে। বলেই তিতলি পূষণের দিকে তাকাল।

তো কি হয় সেই—সেই—পূষণ কিছুতেই মনে করতে পারছে না কি বলল তিতালি দিদি।

কাঁড়া—মানে মোষ—কি হয় রে শম্ভুদাদা? জানতে চাইল তিতলি।

কাঁড়াকে খুঁটায় বানধে—সেইটা হল কাঁড়া খুঁটা। আর কাঁড়াটারে কাটে—সেইটা হল কাঁড়া কাটা। বলেই শম্ভু তিতলির দিকে তাকাল।

এখানে দাঁড়ালে সামনাসামনি উঁচু জমির ওপর চোখে পড়ে রাবণ রাজাকে। দশ মুখ—দশটা মুণ্ডু রাবণের। মুখের রঙ নীল। আকাশ দেখতে পেল।

রাবণের মাথা প্রায় আকাশ ছুঁয়েছে। দেখতে দেখতে ঋতুপর্ণ বলে উঠল, কি গৈরিক, তা হবে চব্বিশ-পঁচিশ ফুট—কি বল?

হ্যাঁ, তা তো হবেই ঋতুদা। ছাব্বিশ ফুটও হতে পারে।

বাঁশের খাঁচার ওপর হলুদ পাজামা পরান হয়েছে রাবণকে। সেই হলদে কাপড় হাওয়ায় খানিকটা-খানিকটা এদিক-ওদিক হয়ে যাচ্ছে। লঙ্কার রাজা—লঙ্কেশ রাবণের কোমরে লাল কাপড়। যেন লাল পট্টি বাঁধা রয়েছে একটা। যেমন যুদ্ধে যাওয়ার আগে বেঁধে নেওয়া হত আগেকার দিনে। বুক পেটে গোলাপি। তাহলে কি দাঁড়াল পরপর—আকাশ মনে-মনে মিলিয়ে নিচ্ছে। নীল মুখ, গোলাপি বুক, কোমরে লাল পটি। কোমর থেকে পা অব্দি হলুদ পাজামা।

কিরে আকাশ, দেখলি রাবণ? দীপংকর জানতে চাইল।

হ্যাঁ জ্যেঠু।

তোরা দেখলি?

স্বপ্ন, পূষণ, তিতলি, টুলকি, কাহিনীদের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল দীপংকর। বাড়ি ফিরে ঠিক-ঠিক আঁকতে পারবি তো?

দীপংকরের কথায় ঘাড় নাড়ে সবাই। —পারবে।

ঠিক আছে, বাড়ি ফিরে দেবুর কাছে তোমাদের সবাইকে নিয়ে কমপিটিশান হবে। কি দেবু! দেবুর দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল দীপংকর।

না, না। আমি মাস্টারমশাই হতে পারব না। বলে দেবু একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল রাবণের দিকে। কি চড়া রঙ। কি কম্বিনেশন। কিন্তু দারুণ মানিয়ে গেছে। নীল আকাশের ব্যাকগ্রাউন্ডে লাগছেও অসাধারণ। ভাবতে ভাবতে দেবু তার ভেতরে একটা ছবি জুড়তে লাগল।

বেশ মেলা-মেলা হয়ে গেছে জায়গাটা। বাঁ দিকে ঝাড়াল মস্ত গাছের নিচে অনেকগুলো সাইকেল পর-পর শোয়ান। পাশাপাশি এখানে ওখানে মোরগ। মোরগের ডাক। মাইকে ভেসে আসছে—কেউ নেশা করবে না। তাস, ঝাণ্ডি খেলবে না। মাইকের কথায় সামান্য বিরতি।

বেলুনঅলারা হেঁটে যাচ্ছে সামনে দিয়ে। বড় বড় রঙিন বেলুন মাথা নাড়ছে হাওয়ায়।

মাইক বলে উঠল, দামদার ভূষণ মাহাত, আপনি যেখানেই থাকন—

পূষণের মনে হল দামদা থেকে আসা ভূষণ মাহাত নিশ্চয়ই হারিয়ে গেছে।

পূষণ, এদিক-ওদিক করবে না। শক্ত করে হাত ধর। পার্থ সাবধান করল পূষণকে।

পূষণ বলল, ঠিক আছে।

বাবা, একটা বেলুন কিনে দেবে? আকাশ খুব আস্তে-আস্তে বলে উঠল।

গৈরিক জবাব দিল, একটু পরে। আগে রাবণ পোড়ানটা হয়ে যাক

তা হলে আমিও একটা কিনব। বলল পূষণ।

একটা আমিও। বলে উঠল স্বপ্ন।

তখনই সেই মানুষটি সাইকেল দাঁড় করাল আকাশদের সামনে। বেশ লম্বা। ভালো স্বাস্থ্য। মাথা জোড়া চকচকে টাক। গালে চওড়া জুলপি। নসিা রঙের ফুল প্যান্টের ভেতর ফুল হাতা চেক শার্ট গুঁজে পরা। পায়ে চামড়ার খয়েরি ব্যাক বেল্ট।

সাইকেলের রডে বাঁধা দো ফেত্তা সুতির রঙিন চাদরের ভেতর থেকে গলা খুলে কঁকর-কোঁ কঁকর-কোঁ করে ডেকে উঠল মোরগ।

সেই টাকমাথা সুতির চাদরের পাট খুবই সন্তর্পণে খুলে আস্তে করে হাতের কায়দায় একটা বড় মোরগ বের করে আনল।

ঝুঁটির কাছটা ছাঁটা। বলতে গেলে মাথার ঝোটন নেই বললেই চলে। অনেকটা উঁচু। লম্বা গলা। বাহারি ল্যাজ। সাইজে প্রায় ছোটখাট একটা ময়ূর।

সাইকেলের রড থেকে তাকে যত্ন করে মাটিতে নামান মাত্র কঁ্যাকর কঁ্যা—কঁ্যাকর কঁ্যাকর কঁ্যা—বলে চারপাশের সবাইকে যেন দুয়ো দিয়ে ডেকে উঠল সেই মোরগ।

টাকমাথা তাড়াতাড়ি মোটা দড়ি দিয়ে পাকুড় গাছের একটা মোটা পোক্ত শেকড়ের সঙ্গে তার পা বেশ শক্ত করে বেঁধে দিল।

কি বিশাল মোরগ! বলে উঠল তিতলি।

এটা কি লড়াই করবে? জানতে চাইল স্বপ্ন।

আকাশ অবাক হয়ে মোরগটাকে দেখছে। কত বড় আর উঁচু। কেমন বুক টান টান করে চলাফেরা, ভাবখানা যেন কাউকেই গ্রাহ্য করি না।

টুলকিও বেশ মন দিয়ে লক্ষ করছে মোরগটাকে। কত বড়। কি গ্র্যানজার চেহারায়। দড়ি বাঁধা পায়ে বিরক্তির সঙ্গে ঝটকান দিতে দিতে মোরগটা ডেকে উঠল পরপর দু-তিনবার।

শম্ভু সিং সর্দার ফিসফিস করে গৈরিককে বলল, কাকা. ই যে লোকটা আইসল না—।

শম্ভুর কথা থেকে গৈরিক জানতে পারল যে টাকমাথা, গালে জুলপি সাইকেল থেকে নামল, তার নাম বাচ্চু উপাধ্যায়। বাচ্চু থাকে হনুমাতা নদী, শ্মশানের দিকটায়। কয়েক বছর আগেও ছিল মিলিটারিতে। এখন রিটায়ারমেন্টের পর বলরামপুরেই।

হঁ—ই ছিল মেলেটারিতে। ইয়ার সাঁড়াটো খুব খুনখার—শম্ভু বাচ্চু উপাধ্যায়ের লড়াইয়ের মোরগটি বিষয়ে বলে যাচ্ছে।

গৈরিকের খুব ইচ্ছে হল এগিয়ে গিয়ে আলাপ করে বাচ্চুর সঙ্গে। যেমন ভাবা তেমন কাজ।

বাচ্চু বলল, তার এই লড়ুয়ে মোরগের বয়েস দু-বছর চার মাস। একে নিয়ে অনেক দূর-দূর অব্দি লড়াতে যায় বাচ্চু। এমনকি সেই টাটা পর্যন্ত।

বাব্বাঃ! টাটা! মনে-মনে ভাবল শম্ভু আর সোনা। এতটা জানত না তারা।

বাচ্চুর মোরগ মাঝে মাঝেই গলা ফাটিয়ে ডেকে উঠছে। আশপাশে চেঁচাচ্ছে আরও মোরগ।

একটু বাদেই পাকুড় গাছের পেছনে সেই ফাঁকা জায়গাটায় শুরু হবে মোরগ লড়াই। সেদিকেই—ওই বাঁ দিকে আকাশের গায়ে একটু-একটু করে হেলে যাচ্ছে সূর্য। ডান দিকে ইটের পাঁজা। দুটি ভাসানে আসা পরপর দুর্গা মূর্তি দাঁড়িয়ে বেদির ওপর। সেই প্রতিমাদের ঘিরে ভিড়। খুব আস্তে-আস্তে ঢাক বাজছে। আর সোজাসুজি তাকালে দশাশই চেহারার রাবণ। যার মাথা প্রায় আকাশ ছুঁয়েছে।

কখন পোড়াবে বাবা রাবণ?

আকাশ জানতে চাইল।

এই তো একটু সন্ধ্যা হলে। সূর্য ডুবলে।

সইনঝা হোক আগে। উয়ার পর তো রাবণটাকে—শম্ভু আকাশকে ভোলাতে চাইছে।

বেলুনওয়ালার থেকে একটা বড় বেলুন কিনে এনে আকাশের হাতে ধরিয়ে দিল সোনা। সঙ্গে-সঙ্গে তিতলি টুলকি স্বপ্নদেরও খুব ইচ্ছে হল বেলুন নেয়ার। স্বপ্ন ফিস ফিস করে তার মা-কে বলল, কিনে দেবে একটা বেলুন আমায়?

স্বপ্নর মা বলল, একটু পরে। এখন দ্যাখ না রাবণ পোড়া হবে।

আকাশের দিকে বেলুনটা উঁচু করে ছুড়ে দিল আকাশ। বেলা শেষের রোদ কমলা রঙের বেলুনকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে।

ওদিকে মাঠে—ফাঁকা জায়গার ভেতর মোরগ লড়াই শুরু হয়ে গেছে।

পায়ে লোহার কাত্তি—ছোট ছুরি বাঁধা মোরগরা ঝুঁটি, গলার লোম ফুলিয়ে ঝটপট ঝটপট করে ডানা ঝাপটে একজন আর একজনের দিকে তেড়ে তেড়ে যাচ্ছে। তারপর খানিকটা ঝটাপটি। তারপরই ছুরির ঘায়ে একটা মোরগ শুয়ে পড়ছে মাটিতে। রক্ত বেরিয়ে আসছে তার পেট বা বুক দিয়ে। অনেক অনেক রঙিন পালক শেষ বেলার আলো মেখে উড়ছে মাঠের চারপাশে। হাওয়ায়।

রক্তমাখা মোরগ ঘাড় কাত করে, ঝুঁটি এলিয়ে পড়ে যাচ্ছে মাঠের ওপর। ঝটপট ঝটপট করে নাড়াচ্ছে হলুদ হলুদ ঠ্যাঙ। সেদিকে তাকিয়ে চোখে জল এল আকাশের। খারাপ লাগছে। খুব খারাপ লাগছে। এসব ভেবে চোখ সরিয়ে নিল আকাশ।

রাবণ পোড়া কখন হবে? জানতে চাইল পূষণ।

হবে। এইবার হবে। পূষণকে বলেই সামনের দিকে তাকাল গৈরিক।

শম্ভু আর সোনা ভিড়ের মধ্যে ঝুঁকে পড়ে মোরগ লড়াই দেখছে। সেই মারামারি, ঠোকরা-ঠুকরি দেখতে-দেখতে হাততালি দিয়ে উঠছে। চেঁচিয়ে উঠল সোনা। গলা ফাটাল শম্ভু।

শম্ভু জানে লড়াইয়ের মোরগ তৈরি করার জন্যে তাকে রেখে দেওয়া হয় অন্ধকারে। দিনের পর দিন অন্ধকার ঘরে রেখে তাকে শুকনো লঙ্কা আর চাল খেতে দেয়া হয়। চোখে আলো পড়ে না। ভেতরে-ভেতরে একটু একটু করে রাগী হয়ে ওঠে মোরগ। তারপর একদিন লড়াইয়ের ময়দানে, পায়ে ধারাল কাত্তি বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়া।

শম্ভু এও জানে হেরে যাওয়া, ঘাড় উল্টে শুয়ে পড়া মরা, নয়ত আধমরা সাঁড়াটাকে নিয়ে গিয়ে কেটে-কুটে রান্না হবে। যে জিতল সে পাবে মোরগ। হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে বাড়ি ফিরে যাবে।

বাচ্চু উপাধ্যায়ের সেই বড়সড় চেহারার মোরগ খুব জোরে বাং দিল। এই মোরগের ঝুঁটি নেই। দেখল শম্ভু। লড়াইয়ের মোরগদের অনেকেরই ঝুঁটি কেটে দেয়। যাতে তারা লড়াই করতে পারে ঠিকঠাক। না হলে ঝোটনে ঠোক্কর মারে লড়াইয়ের অন্য মোরগ। আবার ঝুঁটিওয়ালা সাঁড়াও আছে অনেক।

এসব ভাবতে ভাবতেই শম্ভু দেখতে পেল বেশ খানিকটা দূরে সাইকেল রিকশা করে পর পর চলে যাচ্ছে রাম-রাবণ-হনুমান। খুব জোরে ঢাক বাজছে। কাকা, কোথায় গেল! কাকা! ভিড়ের ভেতর গৈরিককে খুঁজছে শম্ভু। দেখতে পাচ্ছে না। গেল কোথায় কাকা! এতগুলো বাচ্চা। কাকি। কলকাতা থেকে আসা কাকা-কাকিরা। শম্ভু বেশ খানিটা আতান্তরে পড়ে গেল যেন। ঘাড় উঁচু করে ডিঙি মেরে মেরে শম্ভু দেখতে চাইল কাকা—গৈরিককে দেখা যায় কিনা!

এদিকে রাবণ পোড়া দেখার ভিড় ক্রমশ বাড়ছে। ঢাকিদের ঢাক বাজানর সঙ্গে-সঙ্গে সাইকেল রিকশায় বসা রাম-লক্ষ্মণ-হনুমানরা চলে গেল।

ওই তো, ওই তো কাকা আসছে। হাতে ডাং। গৈরিককে দেখে নিশ্চিন্ত হল শম্ভু।

বুঝলি আকাশ! সব জেনে এলাম।

কি জেনে এলে বাবা! জানতে চাইল তিতলি।

ওই যে বাবণ রাজার ব্যাপারে। দশ হাজার টাকার বাজি আসে রাবণের জন্যে। ওড়িশার চ়পো থেকে বাজি আসে।

এই রাবণ তৈরি করতে অনেক টাকা লাগে, তাই না? জানতে চাইল দীপংকর।

হ্যাঁ দাদা। তিন হাজার টাকা।

রাবণের যে মুখ দেখছি গৈরিক, তার সঙ্গে কিন্তু চড়িদার মুখোশের তেমন মিল নেই। অথচ থাকা বোধহয় উচিত ছিল। তাই না!

ঠিকই বলেছেন দেবুদা। বলে একটু থামল গৈরিক। তারপর রাবণের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলল, চড়িদার মুখোশের ব্যাপারটা তো বলরামপুরের রাবণ-মুণ্ডুর ওপর পড়বেই। কিন্তু জিগ্যেস করে জানলাম এবার ফান্ড শর্ট। তেমন চাঁদা ওঠেনি। তাই বাজেট কমাতে হয়েছে। সেই জন্যে চড়িদার মুখোশের ডিজাইন আনান যায় নি। এর জন্যে স্পেশাল কারিগর লাগে।

চারপাশে রোদ্দুর কেমন যেন নরম হয়ে গেছে। সেই জ্বালা-পোড়া ভাবটা আর নেই। পাকুড় গাছের গোড়ায বাঁধা নিজের লড়ুয়ে মোরগকে খুলে নিল বাচ্চু উপাধ্যায়। তারপর কোলে তুলে নিয়ে সাইকেলের হ্যান্ডেলে বাঁধা কাপড়ের দোলার ভেতর একটু-একটু করে ঢুকিয়ে দিল।

নিজের জায়গায় জুত করে বসার আগে সেই প্রায় ময়ূর চেহারার মোরগ ক্যাঁকার-ক্যাঁ—ক্যাঁকার-কাঁ করে ডেকে উঠল। একবার, দুবার। তিনবার।

কি হল চলে যাচ্ছেন? জানতে চাইল গৈরিক।

চলেই যাই।

কেন, লড়াবেন না?

এখানে ওর সঙ্গে লড়ার মতো মোরগ নেই।

দেখলেন ঘুরে?

হ্যাঁ দেখলাম। বলেই সাইকেলে উঠে প্যাডেলে চাপ দিল বাচ্চু। ভিড় সরানর জন্যে বেল টিপল সাইকেলের।

সাইকেলের হ্যান্ডেলে কাপড়ের দোলায় ঝোলা মোরগ আবারও চিৎকার করে উঠল—ক্যাঁকার-ক্যা—

সন্ধেই লেগে গেল প্রায়। হাতঘড়িতে সময় দেখল গৈরিক। সাড়ে পাঁচটা।

জ্বলে উঠল বাজির আগুন।

আকাশে উঠে যাচ্ছে রকেট। নেমে আসছে আলোর ফুল। মালা। লালচে ফুল। নীল ফুল। শাদা ফুল।

নেমে এল প্যারাসুট—দুলতে দুলতে।

রাবণের চারপাশে জ্বলে উঠল তুবড়ি। কি আলো। আর আলো। পূষণ, আকাশ, কাহিনী, স্বপ্ন, তিতলি, টুলকিরা হাততালি দিয়ে উঠল।

শম্ভু বলল. দ্যাখ, দ্যাখ বুইন।

তিতলি বলল, আমি দেখছি। তুই দ্যাখ।

বিশাল হাত-চরকি, প্রায় ছোটখাট একটা চাকা যেন। রাবণের সামনে পুড়ছে। আলো ছড়াচ্ছে।

একটা দুটো তিনটে।

পর পর অনেকগুলো।

চারপাশ আলোয় আলো।

আকাশ থেকেও বাজির আগুন ঝরে পড়ছে আলোর ফুল হয়ে।

খুব ভালো লাগছে স্বপ্ন, পূষণ, আকাশ, কাহিনী. তিতলি, টুলকিদের। আকাশ তো আনন্দে হাততালিই দিয়ে উঠল।

রঙমশাল, হাত-চরকি, রকেট, তুবড়ি. পটকা—সব মিলিয়ে যেন কালি পুজোর রাত।

তারপর রাবণের গায়ে আগুন লাগল। প্রথমে পুড়ে গেল সামনের বেড়া। তারপর দশানন। ঘড়িতে তখন পাঁচটা পঞ্চাশ।

ব্যস, দশ মিনিটের ভেতর সব শেষ। ঘড়িতে তখন ঠিক ছটা।

গোটা রাবণটা একটা আলোর রাবণ হয়ে উঠল। হতে হতে আগুনের রাবণ। তারপর দাউ দাউ। সব শেষ।

এবার বাড়ি ফেরা।

গৈরিক বলল, সবাই বাচ্চাদের হাত শক্ত করে ধর। ফেরার সময়টা খুব ঠেলাঠেলি ভিড় হবে।

ফিরতে ফিরতে স্বপ্ন, আকাশ, পূষণ, তিতলি, টুলকিরা দেখতে গেল বড় বড় হ্যাজাক, কার্বাইডের আলো জ্বলে উঠেছে রিকশা ভ্যানেদের মাথায় মাথায়। সেই সব রিকশা, ভ্যানে ডাঁই করা পানিফল, খোলা সমেত ভাজা বাদাম, ফুচকা, ঘুগনি আরও অনেক রকম চাট।

বালিতে ভাজা বাদামের গন্ধ চারপাশে। একেবারে যাকে বলে মেলা লেগে গেছে।

ফিরে আস্তে-আস্তে গৈরিক দেখতে পেল মাটির বেদির ওপর পাশাপাশি দুই দুর্গা তখনও দাঁড়িয়ে। তাদের মুখে হাতে গায়ে হ্যাজাকের আলো। পাশে ঢাক বাজছে—ডিডিম-ডিম—ডিডিম-ডিম।

ঠাকুরের এই মুখ দেখলে কেমন যেন জল এসে যায় চোখে। মন খারাপ হয়ে যায় খুব।

রাবণ পোড়ার ভিড় ঠ্যালাঠেলি করে ফিরছে বলরামপুরের দিকে। সঙ্গে সাইকেল, মোটর সাইকেল, স্কুটার। পুলিশের জিপ, অ্যামবেসাডার, মারুতিও আছে। মেলা ভাঙা ভিড়ের অনেকের হাতেই বেলুন, গরম বাদামের ঠোঙা। পলিথিনের প্যাকে পানিফল।

## স্বপ্নে রাবণ রাজা

যে রাতে স্বপ্নে রাবণ রাজাকে দেখতে পেল পূষণ।

সেই যে চাণ্ডিল ড্যাম বেড়াতে গেছিল ওরা বলরামপুর থেকে, পথে অ্যামফি থিয়েটার পড়ল।

ফাঁকা জায়গায় খোলা আকাশের নিচে অ্যামফি থিয়েটার। সেখানে সারি দিয়ে পরপর বসার ব্যবস্থা। মাঝে খোলা স্টেজ। আবার যারা থিয়েটার করবে তাদের মেকআপ নেওয়া, সাজ-পোশাক পরার ঘর স্টেজের পেছন দিকে। এটা দেখে দেখে সবটা বুঝতে পারে নি পূষণ। কিন্তু দেখে শুনে

তার খুব ভালো লেগেছে। পাশেই একটা মিউজিয়াম। সেখানে পাথরের নানা মূর্তি। শিব, গণেশ, পার্বতী। অনেক-অনেক বছরের পুরনো। একতলা দোতলা মিলিয়ে এই জাদুঘর। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে এলে কাচ ঘেরা ঘর। সেখানে পাশাপাশি রয়েছে মূর্তিরা।

চাণ্ডিলের ড্যামে পৌঁছনর রাস্তা খুব খারাপ। এবড়ো খেবড়ো। গাড়িতে ঝাঁকুনি লাগে রীতিমতো। সেখানে—ওপরে উঠে গেলে কতটা জল। অনেক- অনেক নীল জল সবুজ-সবুজ পাহাড়ের পাশে। মাথার ওপর ওধাও নীল আকাশ।

জল দেখে খুবই আনন্দ হয় পূষণের।

মনে হয় নেমে ছুঁয়ে আসি।

অনেকটা উঁচুতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিচে জলের নেমে আসা দেখতে-দেখতে বেশ মজা। ফেনা হয়ে কত-কত নিচে নেমে আসছে জল। সেখানে—ওই অতটা নিচে একটা ছোট্ট ছেলে রবারের কালো টিউব ভাসিয়েছে জলে। এ সবই স্বপ্ন, আকাশ, কাহিনী, পূষণরা দেখছে। দেখতে পাচ্ছে টুলকি আর তিতলিরাও।

স্বপ্নের ভেতর চাণ্ডিল-বাঁধ, সেখানে গাড়ি নিয়ে পৌঁছে যাওয়ার রাস্তা, সেই ড্যামের জলে ভেসে বেড়ান রবারের বড় টিউব—সবই দেখতে পাচ্ছে পূষণ।

কাহিনীদিদি চোখ পাকিয়ে পূষণকে বলল, অ্যাই পূষণ, পূষণ, ওভাবে ঝুঁকবি না।

স্বপ্নের মধ্যেই পূষণের মনে পড়ল কাহিনীদিদি সুযোগ পেলেই তার ওপর দিদিগিরি ফলাবে। বকবে। পূষণ চোখের চশমা ঠিক করে টুক করে জিভ দেখাল কাহিনীদিদিকে। তারপর যেন কিছুই হয় নি, এমন ভাবে তাকিয়ে রইল অন্যদিকে।

তখনই ছোট্ট-ছোট্ট কালো-কালো দুটো পাখিকে ডাঙায় বসে জলের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে হঠাৎ নেচে উঠতে দেখল পূষণ।

পূষণ জানে এই পাখি দুটো আসলে নাচ দেখাচ্ছে জলকে। জল তার নিজের খেয়ালে বয়ে যাচ্ছে। তার অত সময় কই নাচন-কোঁদন দেখার। কিন্তু পাখিরা তো নাচবেই। নাচছেই। তাদের ছায়া জলে পড়ছে। ভেঙে যাচ্ছে।

রবারের ফোলান টিউবে বসা ছোট্ট ছেলেটিকে খুব কালো লাগছে ওপর থেকে। টিউবের রঙও আর ছেলেটির রঙ মিলেমিশে এক হয়ে গেছে।

অ্যামফি থিয়েটার, চাণ্ডিল ড্যাম---সব পরপর ভেসে উঠছে পূষণের স্বপ্নে। বিছানার ভেতর পাশ ফিরে পূষণ দেখতে পেল সেই আকাশের নিচে ছাদ না থাকা অ্যামফি থিয়েটারে রাবণ রাজা---রাঙাডির মাঠে পোড়ার আগের রাবণ দশ মুণ্ডু নিয়ে দাঁড়িয়ে।

তার দশখানা নীল মুণ্ডু, হলুদ পাজামা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে আবছা আলোয়। একটু নজর করলে দেখা যাবে গলা থেকে নাভি অব্দি গোলাপি জামা, কোমরের লাল পট্টিও স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

হঠাৎই দশ দিক কাঁপিয়ে দশ মুখে হা হা-হা করে হেসে উঠল রাবণ। নেচে উঠল তার মোটা মোটা ভুরু। পাকান গোঁফ।

রাবণ হাসছে।

ঘুমের ভেতর ভয় করছে পূষণের।

তখনই অ্যামফি থিয়েটারের মাথায় চট করে উঠে এল বড় একখানা হলুদ চাঁদ। আর রাবণ রাজা তার নীল রঙের দশখানা মুণ্ডু নাড়াতে-নাড়াতে বলল, শিগগিরই আমার একটা ছবি আঁক। শিগগিরই আঁক।

পূষণের চোখে ঘুমের সময় চশমা থাকে না। চশমা ছাড়াই পূষণ দেখতে পেল রাজা রাবণ আবারও হো-হো করে হাসছে।

রীতিমতো ভয় লাগছে পূষণের। ইস, এখন যদি গডজিলা এসে যেত! কিংবা কিং কং। দিব্যি যুদ্ধ করতে পারত রাবণের সঙ্গে। চাই কি পটকে দিতেও পারত। একেবারে নক আউট। কিন্তু গডজিলা তো আসছে না। কিং কংও না। কিংবা হ্যারি পটারের সেই দৈত্য। কি যেন নাম। কি যেন নাম। স্বপ্নের ভেতর হাতড়াতে-হাতড়াতে পূষণ নাম খুঁজছে। পাচ্ছে না। আর তখনই অ্যামফি থিয়েটার কাঁপিয়ে কোথা থেকে যেন উদয় হল টিরানোসোরাস রেক্স। কি তার ল্যাজের ঝাপট। এই বুঝি সব ভেঙেচুরে লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে।

চাঁদের হলদেটে আলো এসে পড়েছে রাঙাডির মাঠের রাবণের দশ মুখে। বুকে। হাতে। বুকে। টিরানোসোরাসের ভারি ল্যাজে।

রাবণকে দেখে ভয়ংকর শব্দ করে চিৎকার করে উঠল টিরানোসোরাস

রেক্স। হাঁ করে দেখিয়ে দিল ধারাল দাঁতের সারি। ল্যাজের বাড়ি মারতে লাগল অ্যামফি থিয়েটারের বেঞ্চে।

রাবণও কম যাবে কেন?

দশ মুখে ভয়ানক গর্জন করে দুম-দুম করে ঘুষি মারতে লাগল নিজের বুকে। তারপর হা-হা-হা করে আকাশ ফাটিয়ে উঠল হেসে।

রাবণের সেই হাসির ধাক্কায় আকাশের জ্যোৎস্না মাখা নীলে ঢেউ উঠল। কেমন যেন একটু কেঁপে কেতরে গেল হলদেটে চাঁদ। তাই দেখে আরও আরও জোরে হেসে উঠল রাবণ।

তোরা, তোরা তো গ্রহাণুর ধাক্কাতেই লোপাট হয়ে গেলি পৃথিবী থেকে। বলতে-বলতে রাবণ হঠাৎই ডান হাতে তার দশখানা গোঁফের একটা দিক চুমরে নিল।

হ্যাঁ, সাড়ে ছয় কোটি বছর আগে মেক্সিকো উপকূলে আছড়ে পড়ল গ্রহাণু। ব্যস, যেই না আছড়ে পড়া, অমনি অনেক-অনেক মিথেন গ্যাস মাটির ভেতর থেকে উঠে এসে একটু একটু করে ছড়িয়ে পড়ে মিশে গেল হাওয়ায়।

রাবণ এতক্ষণ মন দিয়ে শুনল টিরানোসোরাসের কথা। মাথার ওপর হলুদ চাঁদ, সে ও অবাক হয়ে শুনলো ডাইনোর গল্প। শুনতে শুনতে চাঁদ বলল, জানি তো। মিথেন গ্যাসের সঙ্গে বজ্র মেঘের ঠোকাঠুকিতে সে এক মহা অগ্নিকাণ্ড। তৈরি হল অগ্নিবলয়। তারপর তারা ছড়িয়ে পড়ল পৃথিবীময়। তারপর শুধু দাউ-দাউ। দাউ-দাউ। ধূমকেতু নয়, গ্রহাণুই আছড়ে পড়ল পৃথিবীতে।

রাবণ দশ মুখে হাঁ করে বেশ খানিকটা অধৈর্য সুরেই বলে উঠল— অসহ্য! থাম। সেই কখন থেকে ব্যাজর-ব্যাজর-ব্যাজর-ব্যাজর করছ। আর পারা যায় না। এবার মাথা ধরে যাবে। আর দশটা মাথা একসঙ্গে ধরলে অত অমৃতাঞ্জন যোগাবে কে? কে সাপ্লাই দেবে শুনি, মাথা ধরার বাম্? দশটা কপাল, মাথা একসঙ্গে ব্যথা শুরু হলে কি হয়, তুমি জান?

রাবণের বকুনিতে চুপ করে গেল চাঁদ।

টিরানোসোরাস রেক্স অ্যামফি থিয়েটারের বেঞ্চে ল্যাজ ঠুকে বলল, আমি কিন্তু বলবই। আমাকে দাবড়ানি দিয়ে থামাতে পারবে না।

ঘুমের মধ্যেই পূষণ দেখতে পেল অ্যামফি থিয়েটারের পাথুরে দেয়ালে

জ্যোৎস্নার জলছাপ। দূরে দূরে নীল-নীল পাহাড়ের মাথায় চাঁদের আলো। মাথা খোলা অ্যামফি থিয়েটারের গায়ে-গায়ে, আশপাশে যে সবুজ সবুজ গাছ, ঝোপ —তাদেরও ঘিরে আছে চাঁদের রঙ।

ডাইনোসর তার ল্যাজ অ্যামফি থিয়েটারের বসার জায়গায় আছড়াতে আছড়াতে বলল, সাড়ে ছ কোটি বছর আগেও প্রচুর মিথেন গ্যাস জমত পৃথিবীর পেটের ভেতর। গাছ-জীব-জন্তুর ফসিল থেকে তৈরি হয় এই গ্যাস—

আঃ—থামাও তো তোমার বকবকানি। একেবারে সবজান্তা সজারু দেখছি। সব সময় বকর-বকর-বকর। দিল কানের পোকা বের করে।

রাবণের মুখে 'সবজান্তা সজারু' কথাটা শুনে বেশ মজা পেল পূষণ। ঘুমের মধ্যেই এক পশলা হেসে নিল সে।

কিন্তু টিরানোসোরাস রেক্স তো থামার পাত্তর নয়। সমান তালে বলে চলল।

'জুরাসিক পার্ক' সিনেমাতে যেমন দেখা গেছিল, তেমনই ঘাড় বাঁকিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে টিরানোসোরাস রেক্স বলে উঠল, শক ওয়েভ। শক ওয়েভ। তীব্র শক্তিশালী কম্পন। যেমন এখনকার সুপার-সোনিক জেট বিমান আকাশে উড়লে বায়ুমণ্ডলে হয়, তেমনই। বৈজ্ঞানিকরা একে বলেন, সনিক বুম্। সে যাকগে। গ্রহাণু যখন আছড়ে পড়ল পৃথিবীর বুকে, তখনই সমুদ্রের নিচে থেকে উঠে আসা শক ওয়েভ ছড়িয়ে গেল সমস্ত পৃথিবীতে। ব্যস, আমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলাম। বলতে-বলতে আবারও দমাস করে ল্যাজ আছড়াল টিরানোসোরাস রেক্স। তার সেই ল্যাজের বাড়িতে থরথর করে কেঁপে উঠল অ্যামফি থিয়েটারের স্টেজ, দেয়াল, বসার জায়গা, দূরের নীল-নীল পাহাড়, পাশের গাছপালা, ঝোপ-জঙ্গল।. এমন কি আকাশের চাঁদও।

তবে রে—সেই কথা বলে যাচ্ছে, যত বারণ করছি! দাঁড়া তো—বলে রাবণ এবার দশ মুণ্ডু নিয়ে দাঁত কিড়মিড়-কিড়মিড় করতে-করতে তেড়ে এল টিরানোসোরাস রেক্স-এর দিকে।

টিরানোসোরাসই বা ছাড়বে কেন?

শুরু হয়ে গেল ছড়যুদ্ধ। কোস্তাকুস্তি।

ঘুমের মধ্যে এসব দেখতে দেখতে পূষণ বিড়-বিড় করে বলে উঠল,

তোমরা লড়াই থামাও। এত সুন্দর জায়গাটা ভেঙে তছনছ হয়ে যাবে। নষ্ট হয়ে যাবে। এই জায়গাটাকে নষ্ট ক'র না।

ঘুমের মধ্যেই গোটা অ্যামফি থিয়েটার হুড়মুড়-হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। আর সেই শব্দে ধাক্কাধাক্কিতে ঘুম ভেঙে গেল পূষণের।

চোখ খুলে পূষণ দেখল সে আকাশ আর তিতলিদিদিদের বলরামপুরের বাড়িতে চৌকির ওপর, মশারির ভেতর শুয়ে আছে।

## ডাইনোসর এল

গৈরিকের মা বললেন, আজ রাতে অখিলবাবুর বাগানে রয়াল ছৌ হবে। এটা একটা দেখার জিনিস।

আজ একাদশী। সকালে গোবরডাঙায় ফোন করে ঋতুপর্ণ জেনেছে জল আর বাড়েনি। তবে ট্রেন এখনও চলছে না। প্ল্যাটফর্মে অনেক বানভাসি মানুষ। কবিতাদের বাড়ি—ঘোজাডাঙার কোনও খবর নেই। ওদিকে সব ভেসে গেছে।

রাতে অখিলবাবুর বড় বাগানে আমগাছের ছায়াঘেরা লম্বাটে চৌকো জায়গায়, ছৌ-নাচের আসর বসল। তিন চারটে হ্যাজাক জ্বেলে মাঝখানে ছৌয়ের ব্যবস্থা।

গোল হয়ে ঘিরে বসে আছে সবাই। গৈরিকের মা-ও এসেছেন। একটা চেয়ার এনে বসেছেন বাগানের এককোণে। পায়ে ব্যথার জন্যে মাটিতে বসতে পারেন না।

হঠাৎ খুব জোরে ধমসা-মাদল বেজে উঠল। দীপংকরের মনে হল একেই বোধহয় রণবাদ্য বলে। তারপর নাচতে-নাচতে ঢুকল অসুর। একটু পরে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ। শুরু হল ভয়ংকর যুদ্ধ। হলে হবে কি অসুর সবাইকে হারিয়ে দিচ্ছে। কেউ পারছে না তার সঙ্গে।

এবার গর্জন করতে-করতে ঢুকল সিংহ।

তার ডাকে ভয় পেয়ে আকাশ তাড়াতাড়ি তার বাবার হাত ধরল।

গৈরিক বলল, ভয় কি! আমি তো আছি।

রক্ত জল করা চিৎকার করে সিংহ লাফ দিল অসুরের ওপর। শুরু হল ভয়ানক যুদ্ধ। সঙ্গে-সঙ্গে খুব জোরে বেজে উঠল ধমসা আর মাদাল।

এবার ঢুকে পড়ল দুর্গা। সিংহ ততক্ষণে অনেকটা কাবু করে এনেছে অসুরকে। দুর্গা ত্রিশূল বাগিয়ে সিংহের পিঠে উঠে পড়ল। তারপর ত্রিশূল বিঁধিয়ে দিল মহিষাসুরের বুকে।

মাথার ওপর খোলা আকাশ। তাতে ভেসে আছে একাদশীর চাঁদ। তার আলোয় চারপাশ অন্যরকম।

তখনই সেই কাণ্ডটা ঘটল। পূষণের স্বপ্নে দেখা খোকা-ডাইনো ঢুকে পড়ল ছৌ-নাচের আসরে। একটা নয়, অনেকগুলো। সবগুলোই কচি-ডাইনোসোরাস। চাঁদের আলোয় তেমনই মনে হয়। ওদের মধ্যে থেকে কেউ-কেউ লম্বা গলা বাড়িয়ে আমপাতা খেতে লাগল।

কেউ কিছু বোঝার আগেই একটা খোকা-ডাইনোর গলা ধরে ঝুলে পড়ল পূষণ। তারপর আস্তে-আস্তে ঘুরে গিয়ে বসার ভঙ্গি করতে-করতে বলল, হ্যাট, ডাইনো, হ্যাট। হ্যাট, ডাইনো, হ্যাট—

ব্যস, আর যায় কোথায়! পূষণকে পিঠে নিয়ে খোকা-ডাইনো দৌড়ল অসম্ভব জোরে। পেছন-পেছন বাকিরা।

আকাশে তখন জ্যোৎস্নামাখা চাঁদ। তার আলোয় মাঠ, পুকুর, অখিলবাবুর বাগান, দূরের রেললাইন, পাহাড় সব অন্যরকম।

পূষণকে পিঠে নিয়ে সেই ডাইনোসোর রেললাইনের দিকে ছুটে চলল। কেউই কোনও কথা বলতে পারল না এমন একটা ব্যাপার দেখে।

পূষণের তখন খুব আনন্দ। যেতে-যেতে হাত নেড়ে সবাইকে টা-টা করল পূষণ।